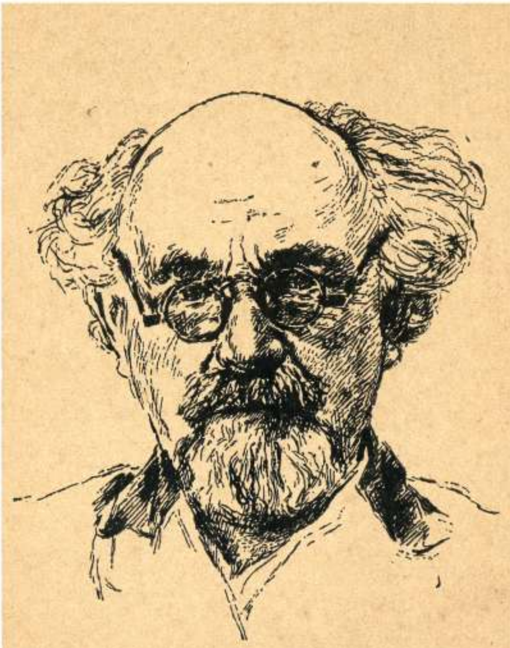

মিখাইল প্রিশ্‌ভিন
সূর্যের ধনাগার



মিখাইল প্রিশ্ভিন

সোভিয়েত ছোট গল্প গ্রন্থমালা

মিখাইল প্রিশ্‌ভিন

সূর্যের ধনাগার

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

অনুবাদ: কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা:
ওলেগ করোভিন

সূচী

সূর্যের ধনাগার

সত্যিকারের রূপকথা

১

একদা দু'টি ছোটো ছেলেমেয়ে এক গ্রামে অনাথ হয়ে পড়লো। গ্রামটি ব্লুদভ জলা থেকে দূরে নয়, পেরেয়াস্লাভ্ল্-জালেস্কি জেলায়। তাদের মা'র মৃত্যু হয়েছিলো অসুস্থতায়, আর বাবা নিহত হয়েছিলো স্বদেশ-প্রেমিক যুদ্ধে।

আমরা একই গ্রামে থাকতাম, যে বাড়িতে এই ছেলেমেয়েরা থাকতো তার একটা বাড়ি পেরিয়ে। তাই অবশ্যই, অন্যান্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে, তাদের সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য আমরা করতাম। তারা ছিলো ভারি মিষ্টি। নাস্তিয়া ছিলো যেন লম্বা ঠ্যাংওলা হলদে একটা মুর্গিছানা। তার চুলগুলো কালোও নয় সোনালীও নয়, কিন্তু তাদের

মাঝেমাঝে ছিলো সোনালী আভা। তার সমস্ত মুখময় সোনার মুদ্রার মতো ছিলো বড় বড় ছুলি। সেগুলো এতো ঘনভাবে ছড়িয়ে ছিলো যে মনে হোতো সেগুলোর জন্য বুঝি জায়গা নেই। সেগুলো ছড়িয়ে ছিলো চতুর্দিকে। শুধু যে জায়গাটায় সেটা ছিলো না সেটা হোলো তার ছোট্ট উপরদিকে বাঁকানো নাকটা।

তার বোনের চেয়ে মিতিয়া দু'বছরের ছোটো। তার বয়স দশ বছরের সামান্য বেশী। সে ছিলো বেঁটে আর খুব শক্ত-সমর্থ, কপালটা বড় আর মাথার পিছনটা চওড়া। সে ছিলো একগুঁয়ে শক্তিশালী ছোট্ট ছেলে।

নিজেদের মধ্যে ইস্কুলের মাস্টাররা তাকে বলতেন, 'ক্ষুদে চাষী'।

নাস্তিয়ার মতোই তার মুখে ছিলো এক রাশ সোনালী ছুলি। নাস্তিয়ার মতোই তার নাকটাতেও ছুলি ছিলো না, আর সেটার ডগাটাও ছিলো উপরদিকে বাঁকানো।

তাদের বাবা-মা'র মৃত্যুর পর চাষী বাস্তভূমিটি এই ছেলেমেয়েদের সম্পত্তি হোলো—একটা বড় কুঁড়ে, জোর্কা নামে গরু, দোচ্‌কা নামে বাছুর, দেরেজা নামে ছাগলী, কতকগুলো বেনামা ভেড়া, মুর্গি, পেতিয়া নামে সোনালী মোরগ আর খ্রেন নামে শূয়োরছানা।

এই সম্পত্তির সঙ্গে বাচ্চারা এই সব জীবিত জীবজন্তুদের সম্বন্ধে অনেক উদ্বেগও উত্তরাধিকারসূত্রে পেলো। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমিক যুদ্ধের কঠিন বছরগুলোয় আমাদের ছেলেমেয়েদের আরো অনেক বেশী কষ্টকে জয় করতে হয়েছে। প্রথমে ছেলেমেয়েদের কয়েকজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আর আমরা, প্রতিবেশীরা, সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই ছেলেমেয়েদের ছিলো ভারি বুদ্ধি আর তারা ছিলো পরস্পরের সবচেয়ে ভালো বন্ধু। অল্প সময়ের মধ্যেই সবকিছুই তারা শিখলো নিজেরা করতে। চমৎকার তারা চালিয়ে নিতে লাগলো।

ছেলেমেয়েরা কী চালাকই না ছিলো। যখনই সম্ভব হোতো গ্রামের জীবনে তারা করতো অংশ গ্রহণ। খেতে, মাঠে, যৌথখামারের খোঁয়াড়ে, সভায়, ট্যাঙ্ক বাধা দেবার পরিখা-গুলোয়—সর্বত্রই দেখা যেতো তাদের ছোটো ছোটো নাকগুলো। আর এই ছোটো ছোটো নাকগুলো ছিলো অত্যন্ত চটপটে।

যদিও আমরা এই গ্রামে নবাগত ছিলাম তবুও প্রত্যেক বাড়ির জীবনযাত্রার সঙ্গে ছিলো আমাদের পরিচয়। আর এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে এমন একটি বাড়িও ছিলো না যেখানকার বাসীন্দারা আমাদের এই ছোট্ট

প্রিয়পাত্রদের বাড়ির বাসীন্দাদের মতো মিলেমিশে বাস করতো আর কাজ করতো।

ঠিক তার মা'র মতো সূর্য ওঠার অনেক আগেই, ভোর হবারো আগে নাস্তিয়া উঠে পড়তো রাখালের বাঁশী শোনার সঙ্গে সঙ্গে। একটা ভাঙা ডাল দিয়ে সে ফটকের ভিতর দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যেতো তার প্রিয় জন্তুগুলোকে, তারপর ছুটে আসতো কুঁড়ের মধ্যে। সে বিছানায় ফিরে না গিয়ে উনুনে আগুন দিতো, আলুর খোসা ছাড়াতো, দুপুরের খাবার প্রস্তুত করে রাখতো এবং সন্ধে পর্যন্ত দেখাশোনা করতো গৃহস্থালীর কাজ।

মিতিয়ার বাবা তাকে শিখিয়েছিলো কাঠ থেকে নানা ধরনের পাত্র বানাতে—পিপে, টব, জন্তুদের জল খাবার পাত্র। তার ছিলো একটা ছুতোরের রেঁদা আর পিপে নির্মেতাদের যন্ত্র। সেটা আকারে তার দ্বিগুণ। এই যন্ত্রটা দিয়ে সে কাঠগুলোকে ঠুকে একত্রে লাগাতো, ঠিকঠাক করতো সেগুলোকে, তারপর লোহার কিংবা কাঠের পাত লাগাতো সেগুলোর চারিদিকে।

তাদের একটা গরু ছিলো বলে ছেলেমেয়েদের বাস্তবিকই তাই বাজারে কাঠের পাত্র বিক্রি করার প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু সর্বদাই প্রচুর ভালো লোকের দেখা পাওয়া যেতো

যারা চাইতো মুখ ধোবার পাত্রের তলায় কাঠের টব রাখতে, বর্ষার জল ধরার বড় পিপে, নুনে জরানো শশা, ব্যাঙের ছাতার জন্য ছোটো পাত্র, কিংবা ফুল-গাছের জন্য উঁচুনীচু কাণাওলা কাঠের টব।

চাহিদা মতো মিতিয়া কাজ করতো আর গ্রাহক করতো তার উপকার। কিন্তু পিপে নির্মেতার কাজ ছাড়াও খামারের সব পুরুষের কাজ পড়তো তার ভাগে, এবং যৌথখামারের সামাজিক কাজেও সে অংশ গ্রহণ করতো। সমস্ত সভায় সে যেতো, বুঝতে চেষ্টা করতো সামাজিক কাজের অর্থ কী এবং নিঃসন্দেহেই খানিক খানিক সে বুঝতো।

নাস্তিয়া যে তার ভাইয়ের চেয়ে দু'বছরের বড় ছিলো সেটা খুব ভালো ব্যাপার। নইলে তার ভাই নিশ্চয়ই চাল মারতে শুরু করতো এবং তার ফলে সেই বন্ধুত্বটা, সেই আশ্চর্য সমভাবটা কখনো থাকতো না। এমনিতেই মিতিয়ার প্রায়ই মনে পড়তো কেমন করে তার বাবা তার মাকে বলতো কী করতে হবে, তাই সে ভাবতো সেও সেই ভাবেই তার বোন নাস্তিয়াকে দেবে আদেশ। কিন্তু তার বোন বিশেষ আমল দিতো না, শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতো... 'ক্ষুদে চাষীটি' তখন রেগে উঠে দারুণ মেজাজ দেখিয়ে বলতো:

'তা হলে এই ব্যাপার!'

'মেজাজ দেখাচ্ছ কিসের জন্যে?'

'তা হলে এই ব্যাপার!' তার ভাই কথাগুলো আওড়াতো রেগে গিয়ে। 'নাস্তিয়া, তুমিই মেজাজ দেখাচ্ছ, আমি না।'

'না, তুমিই!'

'তা হলে এই ব্যাপার।'

তার একগুঁয়ে ভাইকে খানিক খেপিয়ে, নাস্তিয়া তার মাথার পিছনে হাত বোলাতো আর যে মুহূর্তে বোনের ছোটো হাতটা তার ভাইয়ের মাথার চওড়া পিছন দিকটা স্পর্শ করতো বাড়ির কর্তা ত্যাগ করতো তার কল্পিত পৈতৃক প্রভুত্বের সুর।

'চলো সব্জির বাগানের আগাছাগুলো বাছা যাক!' বোনটি বলতো।

আর তারা দু'জনে লেগে যেতো শশার কিংবা আলুর খেতগুলোর আগাছা বাছতে, নয়তো বীট-পালঙের খেতে নিড়ানি চালাতে।

২

গ্রীষ্মকালে জলাজমিতে ক্রানবেরি, সেই টক অথচ উপকারী বেরিগুলো জন্মায় আর সেগুলোকে তোলা হয় শরৎকালের শেষে। সবাই কিন্তু জানে না যে তুষারের তলায় শীতকালটা

কাটাবার পর ক্রানবেরিগুলো হয় সবচেয়ে ভালো, 'মিষ্টি'— এখানকার লোকরা যেমন বলে থাকে।

সেবার বসন্তকালে এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত তুষার তখনো ছোটো ছোটো ফার গাছের ঘন বনে গললো না, কিন্তু জলাজমিটা ছিলো অনেক বেশী গরম এবং তখন একেবারেই সেখানে তুষার ছিলো না। মিতিয়া আর নাস্তিয়া এ কথা জেনে স্থির করলো সেখানে গিয়ে ক্রানবেরি খুঁজবে। ভোর হবার আগেই নাস্তিয়া তার সব পোষ্যদের খাওয়ালো। মিতিয়া কাঁধে নিলো তার বাবার দু'নলা 'তুলা' বন্দুকটা, পকেটে নিলো একটা হেজেল-গ্রাউজ পাখীদের আকর্ষণ করার বাঁশি এবং কম্পাসটা নিতেও ভুললো না। তার বাবা কম্পাসটা না নিয়ে কখনো বনে যায়নি। মিতিয়া প্রায়ই তাকে প্রশ্ন করতো:

'তুমি তো সারা জীবন ধরে বনে যাচ্ছো, বনকে তো তুমি চেনো তোমার হাতের চেটোর মতো। ও-জিনিসটার তোমার দরকার কিসের?'

তার বাবা উত্তর দিতো, 'শোনো দ্‌মিত্রি পাভ্‌লোভিচ, তুমি যখন বনের মধ্যে থাকো তখন ও-জিনিসটা তোমার মায়ের চেয়েও ভালো। মাঝেমাঝে আকাশে মেঘ করে, সূর্য দেখে তুমি বনের মধ্যে পথ চিনতে পারো না, আন্দাজে

ঠিক করতে হয় কোন দিকে যেতে হবে, ভুল হয়, পথ হারিয়ে যায়, খিদে পেয়ে যায়। কিন্তু কাঁটাটার দিকে চাইলেই সেটা বলে দেয় কোথায় তোমার বাড়িটা। কাঁটাটা ধরে বাড়ি পর্যন্ত এলে তুমি খাদ্য আর আশ্রয় পাবে। ওই কাঁটাটা হোলো তোমার শ্রেষ্ঠ সহায়—তোমার বন্ধুরা তোমাকে ঠকাতে পারে, কাঁটাটা কিন্তু সব সময় আঙুল দেখায় উত্তর দিকে, যেখানেই তুমি থাকো না কেন, যেমন ভাবেই এটাকে তুমি নাড়াও-চাড়াও না কেন।'

এই বিস্ময়কর জিনিসটার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিতিয়া এমনভাবে কাঁটাটা বন্ধ করলো যাতে বিনা কারণে পথে যেন সেটা না কাঁপে। তার বাবা যেভাবে করতো সেভাবে পরিচ্ছন্ন করে মোজার বদলে কাপড়ের ফালি পায়ে জড়িয়ে সে বুটের মধ্যে পা ঢোকালো, তারপর সে এমন একটা পুরনো টুপি পরলো যেটা ছিঁড়ে হাঁ হয়ে গেছে—উপরের স্তরটা পৌঁচেছে সূর্যের দিকে, নীচেরটা নেমেছে প্রায় নাক পর্যন্ত। তারপর সে পরলো তার বাবার পুরনো জ্যাকেটটা, কিংবা বলতে গেলে একটা কলার, যার সঙ্গে লেগেছিলো কতকগুলো ফালি—একদা সেটা ছিলো ভালো একটা হাতে-বোনা জামা। এই ফালিগুলোকে একটা কোমরবন্ধ দিয়ে ছেলেটি বাঁধলো তার পেটের উপর, আর তার বাবার

জ্যাকেটটি তার একটা কোট হয়ে গেলো, ঝুলে পড়লো মাটি পর্যন্ত। শিকারীর ছেলে তারপর একটা কুড়ুল গুঁজে নিলো তার কোমরবন্ধে, একটা ঝুলির মধ্যে কম্পাসটা ভরে ঝোলালো সেটাকে তার ডান কাঁধে আর দো-নলা 'তুলা' বন্দুকটি বাঁ কাঁধে। এই ভাবে সব পশুপাখীর কাছে নিজেকে সে করে তুললো আতঙ্কের বস্তু।

অভিযানের জন্য নাস্তিয়া প্রস্তুত হোলো লম্বা তোয়ালে দিয়ে বড় একটা ঝুড়িকে কাঁধে ঝুলিয়ে।

'তোয়ালেটা কিসের জন্যে?' মিতিয়া প্রশ্ন করলো।

'কেন—তুমি কি ভুলে গেছো?' নাস্তিয়া উত্তর দিল। 'তোমার মনে পড়ছে না মা কী করে ব্যাঙের ছাতা তুলতে যেতেন?'

'ব্যাঙের ছাতা। তুমি ত সবজান্তা। সব সময়েই এতো বেশী ব্যাঙের ছাতা পাওয়া যায় যে স্ট্র্যাপটা কেটে বসে কাঁধের ওপর।'

'আর কী করে তুমি জানলে বেশী ক্রানবেরি থাকবে না?'

মিতিয়া তার প্রিয় বুলিটা—'তা হলে এই ব্যাপার!'—বলতে যাচ্ছিলো এমন সময় তার মনে পড়লো যুদ্ধে যাবার আগে ক্রানবেরি সম্বন্ধে বাবা তাদের যে-কথাটা বলেছিলো।

'মনে আছে ক্রানবেরি আর বনের ''প্যালেস্টাইন''* সম্বন্ধে বাবা আমাদের কী বলেছিলেন?'

'আমার মনে পড়ছে বাবা আমাদের বলেছিলেন এমন একটা জায়গা তিনি জানেন যেখানে ক্রানবেরিগুলো ঝুপ ঝুপ করে হাতে এসে পড়ে', নাস্তিয়া বললো, 'কিন্তু কোনো ''প্যালেস্টাইন'' সম্বন্ধে কোনো কথা আমি জানি না। আর আমার মনে পড়ছে তাঁকে 'অন্ধ জলা' নামে একটা ভয়ঙ্কর জায়গার কথা আমাদের বলতে।'

'প্যালেস্টাইন হোলো ঠিক তার পাশের জায়গাটা,' মিতিয়া বললো। 'বাবা বলেছিলেন —উঁচু চূড়োয় গিয়ে উত্তর দিকে যেয়ো আর যখন ''প্রতিধ্বনি বনের'' উঁচু জায়গাটা পেরুবে, উত্তর দিকেই চলতে থেকো, তা হলে দেখবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে ''প্যালেস্টাইনকে'' এগিয়ে আসতে। সেটাকে দেখায় রক্তের মতো লাল, কারণ সেখানে সব জায়গায় ফলে রয়েছে ক্রানবেরি। এ পর্যন্ত কেউ সেখানে যায়নি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মিতিয়া এই কথাগুলো

---

* 'প্যালেস্টাইন', বনের কোনো প্রিয় জায়গা সম্বন্ধে নামটা গ্রামের লোকেরা দিয়েছিলো।

বললো। মিতিয়া যখন কথা বলছিলো নাস্তিয়ার তখন মনে পড়লো গতকাল থেকে এক হাঁড়ি ভর্তি আলু-সেদ্ধ পড়ে রয়েছে। 'প্যালেস্টাইন' সম্বন্ধে সবকিছু ভুলে গিয়ে নিঃশব্দে উনুনের কাছে গিয়ে আলুগুলোকে সে হাঁড়ি থেকে ঝুড়িতে ঢাললো।

'আমরা হয়তো পথ হারাতে পারি,' মনে মনে সে বললো। 'আমাদের সঙ্গে প্রচুর রুটি আর এক বোতল দুধ আছে, এই আলুগুলোও কাজে লাগতে পারে।'

তার ভাই ভাবলো দিদি সব সময়েই বুঝি রয়েছে ঠিক তার পিছনে। তাই তাকে সে 'প্যালেস্টাইন' সম্বন্ধে নানা কথা বলে চললো—সেটা চমৎকার জায়গা, কিন্তু সেখানে যেতে হয় 'অন্ধ জলা' দিয়ে। সেখানে অনেকের হয়েছে মৃত্যু: মানুষ, গরু আর ঘোড়ার।

'তোমার এই 'প্যালেস্টাইনের' গল্প আমায় বলো।'

'তুমি তা হলে শুনছিলে না?' সে চেঁচিয়ে উঠলো।

যেতে যেতে মিতিয়া তাকে আবার ধৈর্য ধরে বললো তার বাবার কাছ থেকে এই 'প্যালেস্টাইন' সম্পর্কে সে যা যা শুনেছিল, যেটার কথা কেউ জানে না, আর যেখানে জন্মায় মিষ্টি ক্রানবেরি।

৩

ব্লুদভ* জলায় আমরাই বহুবার পথ হারিয়েছিলাম। সেটা প্রায় অন্যান্য সব জলার মতোই শুরু হয়েছে ঘন উইলো, অলডার আর অন্যান্য ঝোপ দিয়ে। প্রথম যে ব্যক্তি এই প্রবেশ-পথ দিয়ে জলায় গিয়েছিলো সে গিয়েছিলো হাতে একটা কুড়ুল নিয়ে, ভবিষ্যতে যারা এসছিলো তাদের জন্য কুড়ুল দিয়ে তাকে কাটতে হয়েছিলো পথ। জলার উপরকার ছোটো ছোটো ঢিবিগুলোর উপর দিয়ে মানুষ হেঁটে গিয়েছিলো, পথটা হয়ে গিয়েছিলো একটা নালা, তাতে ছিলো জলের স্রোত। উষার আগে অন্ধকারে ছেলেমেয়েরা এ জায়গাটা পেরুলো সহজেই। ঝোপঝাড়ে যখন আর দৃষ্টি বাধা পেলো না খুব সকালের আলোয় জলাটাকে তারা দেখতে পেলো সমুদ্রের মতো তাদের সামনে বিছিয়ে থাকতে। সত্যি কথা বলতে কি, এক সময় ব্লুদভ জলা ছিলো এক প্রাচীন সমুদ্রের তলদেশ। সত্যিকারের সমুদ্রে যে-রকম দ্বীপ আর মরুভূমিতে ওয়েসিস থাকে তেমনি জলায় থাকে ঢিবি। আমাদের ব্লুদভ জলার এই ঢিবিগুলো বালির, সেগুলো

*এর নিহিত অর্থকে তর্জমা করা যায় না। 'ব্লুদভ জলা' নামের অর্থ—'এমন জলা যেখানে লোকে পথ হারায়'।

পাইন গাছে ঢাকা, লোকে তাদের বলে 'বোরিনা'। জলার উপর দিয়ে খানিক যাবার পর ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে কাছের ঢিবির উপর পৌঁছলো। সেটার নাম 'উঁচু চূড়ো'। তার উপরকার এক ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা আসন্ন উষার ধূসর আলোয় কোনো রকমে চিনতে পারলো 'প্রতিধ্বনি বনকে'।

'প্রতিধ্বনি বনে' পৌঁছবার আগে পথের খুব কাছে এখানে ওখানে তারা রক্তের মতো লাল বেরি দেখতে পেলো। ক্রানবেরি অনুসন্ধানকারীরা প্রথমে এই বেরিগুলোকে ফেলতে লাগলো তাদের মুখের মধ্যে। ইতিপূর্বে শরৎকালীন ক্রানবেরি না খেয়ে বসন্তকালীন বেরি খেতে যারা শুরু করেছে তাদের পক্ষে অম্ল রসকে বরদাস্ত করা খুব কঠিন। কিন্তু গ্রামের অনাথ ছেলেমেয়েরা জানতো শরৎকালীন ক্রানবেরি কী জিনিস, তাই বসন্তকালীন বেরি চেখে তারা চেঁচিয়ে উঠলো:

'এগুলো কী মিষ্টি।'

'প্রতিধ্বনি বনে' ছেলেরা পেলো বড় জায়গার স্বাধীনতা। এমন কি এখনো, এপ্রিল মাসেও, সেটা ঢাকা ঘন সবুজ বিলবেরি ঘাসে। গত বছরের সবুজ উদ্ভিদের মধ্যে শাদা স্নোড্রপ আর ছোটো-ছোটো সুগন্ধী লালচে ফুলগুলো, যেগুলোকে আমরা বলি 'নেকড়ের ছাল', উঁকি মারছে এখান ওখান থেকে।

'ভারি সুন্দর গন্ধ ওগুলোর, একটা তুলতে চেষ্টা করো তো', মিতিয়া বললো।

নাস্তিয়া একটা বোঁটা ভাঙতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না।

'এগুলোকে কেন "নেকড়ের ছাল" বলে?' নাস্তিয়া প্রশ্ন করলো।

'বাবা বলতেন এগুলো দিয়ে নেকড়েরা নিজেদের জন্যে চুবড়ী বুনতো,' তার ভাই উত্তর দিয়ে হেসে উঠলো।

'এখনো কি এখানে নেকড়ে আছে?'

'নেই নাকি? বাবা বলতেন সেই ভয়ঙ্কর 'বুড়ো জমিদার' নামে নেকড়েটা এখানে থাকে।'

'ও, হ্যাঁ, লড়াইয়ের আগে আমাদের পশুগুলোকে মারতো।'

'বাবা বলতেন ওটা থাকে "শুকনো স্রোতে"।'

'ওটা আমাদের আক্রমণ করবে না তো?'

'সে একবার চেষ্টা করেই দেখুক না,' হাঁ-করা টুপি-পরা শিকারী বললো।

ছেলেমেয়েরা যখন এ সব গল্প করছে আর সকালের সূর্য ওঠার যখন সময় হয়ে গেছে 'প্রতিধ্বনি বন' তখন ভরে উঠলো পাখীর গান আর ছোটো ছোটো জানোয়ারের

নানা রকম তর্জন-গর্জনে। তারা সবাই টিবিটায় ছিলো না, জলার গ্যাঁতসেঁতে নরম উপরের অংশ থেকে আসছিল ধ্বনিগুলো। টিবিটার পাইন গাছ আর প্রতিধ্বনিকারী শুক্ন ঢালু জায়গাটা এই সব শব্দের প্রতিধ্বনিকে দিচ্ছিলো ফিরিয়ে।

বেচারা পশুপাখীরা কী চেষ্টাই না করছিলো এমন একটা কিছু বলতে সবাই যা বুঝতে পারে, শুধু একটি সুন্দর কথা! আর ছেলেমেয়েরা, এমন কি নাস্তিয়া আর মিতিয়ার মতো সরল ছেলেমেয়েরাও, বুঝতে পারলো তাদের প্রচেষ্টা। তাদের সবাই চেষ্টা করছিলো একটিমাত্র সুন্দর কথা উচ্চারণ করতে।

একটা ডালে একটা পাখী গান গাইছিলো, সেই প্রচেষ্টায় তার দেহের প্রতিটি পালককে দেখা যাচ্ছিলো কাঁপতে। কিন্তু আমাদের মতো পাখীরা কথা ব্যবহার করতে পারে না, তাই সেগুলোর অর্থ প্রকাশ করার জন্য তাদের হয় গলা কাঁপিয়ে গান গাইতে, করতে হয় চীৎকার আর ঠকঠক শব্দ।

'ট্যাক-ট্যাক!' বিরাট বন্য-কুক্কুট ডেকে উঠলো, কিন্তু অন্ধকার অরণ্যে সেটা প্রায় শোনাই গেলো না।

'কোয়াক্-কোয়াক্!' নদীর উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে বুনো পাতিহাঁস উঠলো চিৎকার করে।

'ক্রিয়াক-ক্রিয়াক!' হ্রদ থেকে শব্দ এলো বুনো পাতিহংসীর।

'গু-গু!' একটা বার্চ গাছের উপর থেকে ঘড়ঘড় করে উঠলো সুন্দর বুলফিঞ্চটা।

ছোটো ধূসর রঙের মাথার চ্যাপ্টা কাঁটার মতো দীর্ঘ ঠোঁটওলা স্নাইপ বুনো ভেড়ার ডাকের মতো শব্দ করে আকাশে যেন চিড় ধরিয়ে দিলো।

কাদা-খোঁচা পাখী যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'সে, যে আমি, সে যে আমি!' কোথায় একটা কালো বন্য-কুক্কুট বিড়বিড় করছিলো আর চাপা হাসছিলো। টারমিগান হাসছিলো শয়তানের মতো।

আমরা, শিকারীরা, বহুকাল আগে, আমাদের শৈশবে শিখি পৃথক করতে, স্বাগত জানাতে, সম্পূর্ণভাবে বুঝতে সেই সব কথাগুলো যা উচ্চারণ তারা চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। আর যখন আমরা বসন্তকালের প্রথম দিকে উষায় অরণ্যে যাই আর তাদের স্বর শুনি এই কথা তাদের আমরা বলি যেন তারা আমাদের বুঝতে পারবে: 'সুপ্রভাত।'

তখন মনে হয় তারাও যেন খুসি হয়েছে, যেন মানুষের মুখ থেকে যে আশ্চর্য কথাটা বেরিয়েছে তারাও বুঝতে পেরেছে তার অর্থ।

উত্তরে তারা তাদের কোয়াক্ আর ট্যাক-ট্যাক উচ্চারণ করে, তাদের সব রকম স্বরে চেষ্টা করে আমাদের অভিনন্দন জানাতে:

'সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!'

কিন্তু এই সব শব্দগুলোর মধ্যে যেটা কোনোটার মতো নয়, সেটা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া গেলো।

'শুনলে ওটা?' স্তিতিয়া বললো।

'নিশ্চয়ই শুনেছি', নাস্তিয়া উত্তর দিলো। 'বহুক্ষণ ধরে ওটা আমি শুনছি, কী জানি কেন ওটা শুনে আমার ভয় করে।'

'ভয় প্যাবার কিছু নেই। বাবা ওটার কথা আমাকে বলেছিলেন আর আমাকে দেখিয়েও ছিলেন—ওটা বসন্তকালে খরগোসের ডাক।'

'কেন ও রকম করে ওরা ডাকে?'

'বাবা বলতেন ওটা চেঁচিয়ে বলছে: ''খরগোস-গিন্নী, সুপ্রভাত''!'

'আর ওই গুমগুমে শব্দটা কিসের?'

'বাবা বলতেন ওটা বকপাখী—জলার ষাঁড়।'

'ওটা গুমগুম করছে কেন?'

'বাবা বলতেন ওর একটা বৌ আছে আর ও তাকে

বলছে নিজের ভাষায়, "সুপ্রভাত, বক-গিন্নী", — অন্য সবাইকার মতো।'

অকস্মাৎ সবকিছুই তাজা আর আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠলো, যেন পৃথিবীর সবটাকে হোলো ধুইয়ে দেওয়া। আকাশটা হয়ে উঠলো উজ্জ্বল এবং সমস্ত গাছের বল্কল আর কুঁড়ি থেকে এলো একটা মধুর গন্ধ। সেই মুহূর্তে সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে এবং সব শব্দের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে এলো এক জয়োল্লাসের শব্দ, মানুষরা সবাই একসঙ্গে আনন্দে চীৎকার করলে যেমন শোনায় শব্দটা সেই রকম:

'জয়। জয়!'

'ওটা কী?' আনন্দে ঝলমল করে উঠে নাস্তিয়া প্রশ্ন করলো।

'বাবা আমাকে বলেছিলেন ওটা সারসদের সূর্য-অভিনন্দন। ওর মানে অল্পক্ষণের মধ্যেই সূর্য উঠবে।'

কিন্তু মিষ্টি ক্রানবেরি অনুসন্ধানকারীরা যখন বিরাট জলায় নামলো তখনো সূর্য ওঠেনি। সূর্যকে অভিনন্দন জানাবার উৎসব এখানে তখনো শুরু হয়নি। ছোটো ছোটো বাঁকাচোরা ফার আর বার্চ গাছগুলো তখনো রাত্রির ধূসর কম্বলে ঢাকা। 'প্রতিধ্বনি বন' থেকে যে সুন্দর শব্দগুলো আসছিলো এই

আবরণ সেগুলোকে দিচ্ছিলো চেপে। একমাত্র শব্দ শোনা গেলো এক বিষণ্ণ আর্তনাদের।

'এটা কী, মিতিয়া?' ভয়ে কুঁকড়ে উঠে নাস্তিয়া প্রশ্ন করলো। দূরে ও-রকম ভয়ানক কে আর্তনাদ ছাড়ছে?'

মিতিয়া উত্তর দিলো, 'বাবা বলতেন ওগুলো হচ্ছে "শুকনো স্রোতে" নেকড়ের চীৎকার। আমার মনে হয় ওটাই "বুড়ো জমিদার"। বাবা বলতেন "শুকনো স্রোতের" তীরে সব নেকড়েদেরই মেরে ফেলা হয়েছে, কিন্তু "বুড়ো জমিদারকে" কেউ মারতে পারে না।'

'কেন ও ও-রকম ভয়ঙ্কর চীৎকার করে?'

'বাবা বলতেন বসন্তকালে নেকড়েগুলো চীৎকার করে কারণ তাদের কিছুই খাবার থাকে না। আর "বুড়ো জমিদার" তো একেবারে একলা! তাই সে চীৎকার করে।'

মনে হোলো জলা জায়গার স্যাঁতসেঁতে ভাবটা তাদের শরীর ফুঁড়ে হাড়গুলোকে পর্যন্ত যেন কালিয়ে দিচ্ছে। তাদের একটুও ইচ্ছে হোলো না স্যাঁতসেঁতে পঙ্কিল জলাটা দিয়ে আর এগুতে।

'কোন পথ আমরা ধরবো?' নাস্তিয়া প্রশ্ন করলো।

মিতিয়া কম্পাসটা বার করে, উত্তর দিকটা আবিষ্কার

করে, উত্তর দিকে-যাওয়া একটা অস্পষ্ট পায়ে-চলা পথের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো :

'ওই পথটা দিয়ে আমরা উত্তরে যাবো।'

'না,' নাস্তিয়া বললো, 'ওই যে বড় পথটা দিয়ে সবাই যায় আমরা সেই পথ দিয়ে যাবো। বাবা সেই যে ভয়ঙ্কর ''অন্ধ জলা'' আর সেখানে কত মানুষ আর পশু যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার কথা বলতেন সেটা কি তোমার মনে নেই? না, না, লক্ষ্মী মিতিয়া, ওখানে আমরা যাবো না। সবাই এই পথে যায়, অতএব ওখানেই ক্রানবেরি জন্মায়।'

'এ বিষয়ে তুমি ছাই জানো।' শিকারী তাকে বাধা দিলো। 'আমরা উত্তর দিকে যাবো, বাবা যে পথ বলেছিলেন, সেখানেই ''প্যালেস্টাইন'' আছে, যেখানে এখনো কেউ যায়নি।'

নাস্তিয়া দেখলো যে তার ভাই চটে উঠতে শুরু করেছে। তাই সে অকস্মাৎ মৃদু হেসে তার মাথার পিছনটায় হাত বোলাতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে মিতিয়া ঠাণ্ডা হয়ে গেলো আর বন্ধুরা চললো কাঁটাটা যে-পথ দেখিয়েছে সে-পথ ধরে। তারা আর পাশাপাশি চললো না, হাঁটতে লাগলো একজনের পিছনে একজন।

৪

দু'শ বছর আগে বীজ-বপনকারী বাতাস ব্লুদভ জলায় দুটি বীজকে উড়িয়ে এনেছিলো — পাইন আর ফার গাছের বীজ। একটা বড় চ্যাপটা পাথরের পাশে একই গর্তে পড়েছিলো তারা। তখন থেকেই, হয়ত দু'শ বছর ধরে পাইন আর ফার গাছ সেখানে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে। শৈশবেই জড়িয়ে গিয়েছিলো তাদের শিকড়গুলো, পাশাপাশি তাদের কাণ্ডগুলো উঠেছিলো উপরে আলোর দিকে, চেষ্টা করেছিলো একে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে। বিভিন্ন জাতের এই গাছগুলো তাদের শিকড় দিয়ে লড়াই করেছিল খাদ্যের জন্য, আলো ও বাতাসের জন্য তাদের ডালপালা দিয়ে। যত তারা লম্বা হয়ে উঠতে লাগলো, যত মোটা হয়ে উঠতে লাগলো তাদের গুঁড়িগুলো তত তারা একে অন্যের জীবন্ত দেহকে ভেদ করেছিলো তাদের শুকনো ডালপালা দিয়ে, জায়গায় জায়গায় সেগুলোকে সোজা ঢুকিয়ে দিয়েছিলো পরস্পরের গুঁড়িগুলোর মধ্যে। যে বিদ্বেষপরায়ণ বাতাস এই গাছগুলির উপর এরকম কষ্টকর জীবন জোর করে চাপিয়েছিলো, মাঝেমাঝে তাদের ডালপালাকে দুলিয়ে সেটা বয়ে যেতো তাদের মাথার উপর দিয়ে। আর তখন সমস্ত ব্লুদভ জলার উপর এই গাছগুলো আর্তনাদ করতো জীবন্ত প্রাণীর মতো, ফলে জলার

শ্যাওলা-ঢাকা ছোটো ঢিবিতে শেয়ালটা পাকিয়ে গোল হয়ে তুলতো তার তীক্ষ্ণ নাকটা। এই আর্তনাদ ও চীৎকারকে সমস্ত জীবিত প্রাণীরাই ভালো করে চিনত। একটা কুকুর হাঘরে হয়ে জলায় পালিয়ে এসেছিলো। ঐ শব্দগুলো শুনে মানুষের জন্য মন কেমন করায় সে উঠতো ডেকে আর নেকড়েটা চীৎকার করতো মানুষের প্রতি তার চিরকালের ঘৃণার জন্য।

ছেলেমেয়েরা যখন সেই 'চ্যাপ্টা পাথরের' কাছে পৌঁছলো ঠিক সেই মুহূর্তে সূর্যের প্রথম রশ্মিগুলো নীচু বাঁকা জলার ফার আর বার্চ গাছগুলোর উপর দিয়ে ছুটে এসে 'প্রতিধ্বনি বনকে' আলোকিত করে তুলছে। পাইন গাছের বিরাট বিরাট গুঁড়িগুলোকে দেখাচ্ছে প্রকৃতির কোনো এক বিরাট মন্দিরের জ্বলন্ত মোমবাতির মতো। বিরাট সূর্যের উঠে আসার জন্য পাখীদের অভিনন্দন এখানে খুব অস্পষ্ট শোনা যায়, এই চ্যাপ্টা পাথরে, যার উপর ছেলেমেয়েরা বিশ্রামের জন্য বসেছিলো।

সমস্ত প্রকৃতি একেবারে চুপচাপ। ছেলেমেয়েরা এখন ঠাণ্ডায় খানিক কাতর হয়ে পড়ায় এমন চুপচাপ যে কোসাচ নামে কালো বন্য-কুক্কুটটা তাদের ভ্রূক্ষেপই করলো না। সে অনেক উপরে একটা ডালে বসেছিলো।

সেখানে পাইন আর ফার গাছের ডালপালাগুলো গিয়েছিলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে, ফলে দুটো গাছের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো একটা সেতুর। কোসাচ বসেছিলো এইখানে। জায়গাটা তার পক্ষে বেশ প্রশস্তই। সে পাইন গাছের চেয়ে ফার গাছটারই বেশী কাছে বসেছিলো আর তাকে মনে হচ্ছিলো উদীয়মান সূর্যে সে যেন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে। তার মাথার ঝুঁটিটা জ্বলতে লাগলো আগুনের ফুলের মতো, তার বুকের কালো পালকগুলোর নীল আভাটাকে দেখাতে লাগলো প্রায় সবুজ। তার রামধনু রঙের লেজটা ছড়িয়ে পড়েছে ল্যায়ারের মতো। সেটাই তার শরীরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ। জলার ক্ষুদে ক্ষুদে ফারগুলোর উপর সূর্যকে উঠতে দেখে সে তার এই উপরকার সেতুতে অকস্মাৎ এক লাফ মারলো, তাতে দেখা গেলো তার লেজ আর ডানার নীচেকার তুষার-শুভ্র, নিখুঁতভাবে কাচা অন্তর্বাসগুলো আর সে চীৎকার করে উঠলো:

'চুফ, শি।'

কালো বন্য-কুক্কুটের কাছে সম্ভবত 'চুফ' মানে সূর্য আর 'শি' হয়তো 'সুপ্রভাতের' মতো কিছু।

কোসাচের এই প্রথম ডাক 'চুফ-শি'র প্রত্যুত্তরে সমস্ত জলাজমিটা সেই একই ডাকে ভরে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

তার সঙ্গে শোনা গেলো বহু ডানা ঝাপটার শব্দ, এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'চ্যাপটা পাথরের' কাছে হুবহু কোসাচের মতো চেহারার বহু সংখ্যক বড়বড় পাখী এসে তার চারিপাশে বসলো।

ছেলেমেয়েরা বসেছিলো ঠাণ্ডা পাথরটির উপর, রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলো সূর্য-রশ্মির তাদের উপর পড়ার এবং তাদের শরীরকে গরম করে তোলার জন্য। অবশেষে কাছের ছোটো ছোটো ফার গাছের চূড়োগুলোকে আলোকিত করে প্রথম রশ্মি পড়লো এসে ছেলেমেয়েদের গালের উপর। আর কোসাচ সবচেয়ে উপরকার ডালে বসে লম্ফঝম্ফ এবং 'চুফ-শি' শব্দ থামিয়ে সূর্যকে জানালো তার অভিনন্দন। সেতুর মত ডালে নীচু হয়ে গুঁড়ি মেরে বসে ডালটার সঙ্গে লম্বা গলাটাকে প্রসারিত করে সে ছোট্ট নদীর কুলুকুলু ধ্বনির মতো একটা টানা গান ধরলো। প্রত্যুত্তরে অসংখ্য পাখী, সবগুলোই তার মতো কালো বন্য-কুক্কুট, দেখতেও হুবহু তার মতো, তাদের গলাগুলো বাড়িয়ে ধরলো একই সুরে গান। এখন মনে হোলো যেন একটা নদী কুলুকুলু করে বয়ে চলেছে অদৃশ্য উপলখণ্ডের উপর দিয়ে।

বারবার আমরা, শিকারীরা, খুব সকালের সেই অন্ধকার

ঠাণ্ডা প্রহরে বসে উত্তেজিত হয়ে এই গান শুনেছি আর বুঝতে চেষ্টা করেছি তার অর্থ। আর যখন আমরা আমাদের মতো করে তাদের ডাকগুলোকে উচ্চারণ করতে চেষ্টা করেছি সেটা অনেকটা এই রকম হয়ে উঠেছে:

উর-টুর-গু,
আমি ছুটবো তোমার দিকে!
উর-টুর-গু,
তোমার দিকে, তোমার দিকে!

এইভাবে গলা কাঁপিয়ে কালো বন্য-কুক্কুটগুলো বন্ধুত্বপূর্ণ ঐকতানে যোগ দিলো, এদিকে তারা প্রস্তুত হতে লাগলো লড়াই করার জন্য। যখন তারা গলা কাঁপিয়ে গান গাইছিলো তখন ঘন ফার গাছের চূড়োর একেবারে ভিতরে ঘটলো ছোট্ট একটা ঘটনা। একটা কাক বসেছিলো তার বাসায়, প্রাণপণে সে চেষ্টা করছিলো কোসাচের নজর এড়াতে। কোসাচ তার মিলন-সঙ্গীত গাইছিলো বাসাটার খুব কাছে। সানন্দেই কাকটা কোসাচকে তাড়িয়ে দিতো, কিন্তু সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে সে তার ডিমগুলোকে অনাবৃত করতে ভয় পাচ্ছিলো। কাক-বাবার কর্তব্য বাসাটাকে পাহারা দেওয়া। কিন্তু সকালের রোঁদে থেকে এখনো সে ফেরেনি।

সম্ভবত ওড়বার সময় সন্দেহজনক কিছু একটা সে দেখেছে, তাই তার দেরী হচ্ছে। তার ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে করতে কাক-মা তার বাসায় গুটিসুটি মেরে বসে চুপচাপ রইলো ইঁদুরের মতো। অকস্মাৎ সে তার সঙ্গীকে বাসার দিকে উড়ে আসতে দেখে জোরে চীৎকার করে উঠলো: 'ক্রা!' স্পষ্টই তার মানে 'সাহায্য করো।'

'ক্রা' ডেকে উঠলো কাক-বাবা, গায়কদের উদ্দেশ্য করে। সে বোঝাতে চাইলো কে যে কাকে তেড়ে যাবে সে কথাটা জানা নেই।

এক চাউনিতে সমস্ত অবস্থাটা বুঝে নিয়ে, যে ডালগুলোর সেতুর কাছে তার বাসাটা তৈরী এবং যেখানে বসে কোসাচ তার মিলন-সঙ্গীত গাইছিলো সেখানে কাক-বাবা নামলো। কাকের বাসাটা ছিলো ফার গাছটার কাছে, আর কাক নেমে বসলো পাইন গাছ ঘেঁষে। সে অপেক্ষা করতে লাগলো ঘটনার ক্রমবিকাশের জন্য।

কাককে একেবারে গ্রাহ্যই না করে কোসাচ সব শিকারীদের পরিচিত এক ডাক ছাড়লো:

'কার-কার-কেক্স্!'

এটা মোরগদের লড়াই শুরু হবার সঙ্কেত। কত পালকই না উড়তে লাগলো। যেন সেও সঙ্কেত

মানছে এই ভাবে কাক-বাবা সেতুর উপর দিয়ে খুরখুর করে অলক্ষ্যে এগিয়ে গেলো কোসাচের দিকে।

আমাদের মিষ্টি ক্রানবেরি শিকারীরা পাথরটার উপর স্থির হয়ে বসেছিলো মর্মরমূর্তির মতো। তাদের সামনে জলার বেঁটে বেঁটে ফার গাছগুলোর উপর উষ্ণ, স্বচ্ছ সূর্য দেখা দিলো। সেই সঙ্গে আকাশে দেখা দিলো ছোটো এক টুকরো মেঘ। একটা ঠাণ্ডা নীল তীরের মতো উদীয়মান সূর্যের দিকে দ্রুত ছুটে গিয়ে তাকে সে করে ফেললো দু টুকরো। বাতাসের আর এক ঝাপটায় পাইন গাছটা হেলে পড়লো ফার গাছটার উপর, উত্তরে গরগর করে উঠলো সেটা।

পাথরের উপর বিশ্রাম করে শ্রান্তি দূর হওয়ায় এবং রৌদ্রে গরম হয়ে ওঠায় নাস্তিয়া আর মিতিয়া উঠে দাঁড়ালো যাত্রা করার জন্য। কিন্তু পাথরটার ঠিক তলা থেকেই জলার চওড়া পথটা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেছে: একটা পথ গেছে ডান দিকে চলে, সেটাকে দেখাচ্ছে নিরাপদ আর শক্ত, এদিকে অস্পষ্টতর একটা পথ চলে গেছে সোজা।

কম্পাস দিয়ে পথের দিগনির্ণয় করে মিতিয়া অস্পষ্টতর পথটার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললো:

'আমাদের এই পথটা নেওয়া উচিত, এটা গেছে উত্তর দিকে।'

'কিন্তু এটা তো একেবারেই পথ নয়,' রেগে জবাব দিলো নাস্তিয়া।

'তা হলে এই ব্যাপার!' মিতিয়া রেগে উঠে বললো। 'লোকে এর ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে, তার মানেই এটা একটা পথ। আমাদের উত্তর দিকে যেতে হবে। চলে এসো, বকবকানি থামাও।'

মিতিয়া তার চেয়ে ছোটো বলে তার কথা মানতে নাস্তিয়ার মানে বাধলো।

'ক্রা।' বাসা থেকে ডেকে উঠলো কাকটা।

কাক-বাবা সেতুর উপর দিয়ে কোসাচের দিকে আরো কয়েক পা এগিয়ে গেলো। এবার সে তাদের মধ্যেকার ব্যবধানের অর্ধেকটা করলো অতিক্রম।

দ্বিতীয় একটা গাঢ় নীল রঙের তীর পেরিয়ে গেলো সূর্যের মুখের উপর দিয়ে এবং আকাশের মাঝখানে জমে উঠলো একটা ধূসর স্তূপ।

নাস্তিয়া সাহসে ভর দিয়ে চেষ্টা করলো তার বন্ধুকে বোঝাতে।

সে বললো, 'দেখো, আমার পথটা কী রকম শক্ত। প্রত্যেকে যায় এর ওপর দিয়ে। অন্য লোকদের চেয়ে নিজেদের আমরা বেশী চালাক বলে কেন মনে করবো?'

সেই একগুঁয়ে 'ক্ষুদে চাষীটি' দৃঢ়স্বরে বলে উঠলো, 'অন্যরা যাক ও-পথ দিয়ে। বাবা যেমন শিখিয়েছেন আমরা সেভাবে নিশ্চয়ই অনুসরণ করবো কাঁটাটাকে আর উত্তরে যাবো "প্যালেস্টাইনের" দিকে।'

'বাবা আমাদের রূপকথার গল্প বলেছিলেন, এটাকে সত্যি বলে বোঝাতে চাননি', নাস্তিয়া বললো। 'আর খুব সম্ভব উত্তরে "প্যালেস্টাইন" বলে কোনো জায়গা নেই। কাঁটাটাকে অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে দারুণ বোকামী হবে। আমরা "প্যালেস্টাইনে" পৌঁছতে পারবো না, নিশ্চয়ই গিয়ে পড়বো "অন্ধ জলায়"।'

'বেশ কথা', বলে অকস্মাৎ মিতিয়া ঘুরে দাঁড়ালো। 'তোমার সঙ্গে আর আমি তর্ক করবো না। তুমি তোমার পথে যাও যে পথে সব মেয়েরা যায় ক্রানবেরি আনতে। আমি একলা আমার পথ ধরবো—উত্তর দিকে।'

এই বলে সে তার নিজের পথে এগিয়ে চললো। ক্রানবেরির ঝুড়ি আর খাবারের কথাটা গেলো একেবারে ভুলে।

নাস্তিয়ার এ কথাটা তাকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু সে এমন চটে উঠেছিলো যে মিতিয়ার দিকে শুধু থুথু ফেললো। তার মুখটা হয়ে উঠলো আগুনের মতো টকটকে। ক্রানবেরির জন্য সে ধরলো সাধারণ পথটা।

'ক্রা!' বললো কাকটা।

আর নিজের ও কোসাচের মধ্যেকার দূরত্বটা কাক-বাবা দ্রুত অতিক্রম করে কোসাচকে প্রাণপণে ঠোকরালো। কোসাচ চমকে উঠলো, কেউ যেন তার পিঠে ঢেলে দিয়েছে ফুটন্ত জল। অন্যান্য যে সব কালো বন্য-কুক্কুট উড়ে পালাচ্ছিলো সে চেষ্টা করলো তাদের সঙ্গে যোগ দিতে। কিন্তু ক্রুদ্ধ কাকটা তাকে ধরে ফেলে তার লেজ থেকে শাদা আর রামধনু রঙের এক গোছা পালক নিলো টেনে। সেগুলো ছড়িয়ে গেলো বাতাসে। সে তার পিছন পিছন উড়ে চললো, তাড়িয়ে নিয়ে গেলো তাকে নিজের বাসা থেকে অনেক দূরে।

তখন আকাশের ধূসর স্তূপটা এলো নেমে, ঢেকে দিলো সূর্য আর তার উজ্জ্বল রশ্মিগুলোকে। নিষ্ঠুর বাতাসের এলো তীক্ষ্ণ একটা ঝাপটা। যে গাছগুলোর শিকড় পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এবং যেগুলোর ডালগুলো বিদ্ধ করেছে পরস্পরকে, সেগুলো ব্লুদভ জলাকে ভরে তুললো তাদের চীৎকার, আর্তনাদ আর বিলাপে।

৫

গাছগুলোর বিলাপধ্বনি এমন করুণ যে সেটা আন্তিপিচ'এর কুটিরের কাছে আধ-ঢাকা আলুর গর্তের ভিতর থেকে বার

করলো শিকারী কুকুর ত্রাভ্‌কাকে। সেই গাছগুলোর সঙ্গে সুর মিলিয়ে সে শুরু করলো আর্তনাদ করতে।

কী কারণে অত সকালে কুকুরটা তার উষ্ণ, আরামদায়ক বাসস্থান ছেড়ে গাছগুলোর করুণ বিলাপের উত্তর দিলো?

সে দিন সকালের গাছগুলোর চীৎকার, আর্তনাদ আর বিলাপ বনের মধ্যে পরিত্যক্ত কিংবা পথ-হারানো কোনো শিশুর এবং তার করুণ কান্নার কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

আর সেই কান্নাটা ত্রাভ্‌কা সহ্য করতে পারে না। সে শব্দ মাঝ-রাত্রে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, ঘুম ভাঙিয়ে দেয় রাত্রির যে-কোনো সময়ে। যে দুটো গাছ একত্রে বড় হয়ে ওঠার জন্য অভিশপ্ত হয়েছে তাদের বিলাপধ্বনি কুকুরটা সহ্য করতে পারে না, কারণ সেটা তার নিজের দুঃখের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

দু'বছর আগে ত্রাভ্‌কার সেই দারুণ দুর্ঘটনাটা ঘটেছিলো : যে বন-রক্ষীকে সে পুজো করতো, সেই বৃদ্ধ শিকারী আন্তিপিচের হয় মৃত্যু।

বহু বছর ধরে শিকার করার জন্যে আন্তিপিচের কুটিরে যাওয়া আমাদের অভ্যাস। আন্তিপিচ এতো বুড়ো হয়েছিলো যে মনে হোতো বয়সের হিসেবটা সে নিজেই ভুলে গিয়ে বেঁচে রয়েছে তার অরণ্যের কুটিরে। মনে হোতো কখনো সে মরবে না।

'তোমার বয়েস কত, আন্তিপিচ?' আমরা প্রশ্ন করতাম। 'তোমার বয়েস কি আশি?'

'বেশী।'

'এক শ'?'

'কম।'

মনে হোতো আমাদের সঙ্গে সে তামাসা করছে, সে জানে তার আসল বয়সটা। তাই আমরা প্রশ্ন করে যেতাম:

'তোমার তামাসা ছাড়ো, আমাদের সত্যি কথা বল—তোমার বয়েস কত?'

'সত্যি কথা', বৃদ্ধ উত্তর দিতো। 'তোমাদের সত্যি কথাটা বলবো যদি তোমরা আমাকে বলো সত্যি কী, তাকে দেখতে কেমন, কোথায় সেটা থাকে, কেমন করে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়?'

সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হোতো।

'আমাদের চেয়ে তুমি বড়, আন্তিপিচ', আমরা বলতাম। 'নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে সত্যি যে কী তা তুমি বেশী জানো।'

'জানিই তো', হেসে আন্তিপিচ উত্তর দিতো।

'তা হলে আমাদের বল!'

'না, এখনো আমি বেঁচে আছি বলে সে কথা তোমাদের

বলতে পারবো না, সেটাকে তোমাদের নিজেদের খুঁজতে হবে। আমি মরবার ঠিক আগে আমার কাছে এসো, তোমাদের কানে কানে সব সত্য সম্বন্ধে সব কথা বলবো। তোমরা আসবে, তাই না?'

'নিশ্চয়ই আমরা আসবো। কিন্তু আমরা হয়তো জানতে পারবো না কখন আসা দরকার, আর আমরা যখন থাকবো না তখনই হয়তো তুমি মরে যাবে।'–

তামাসা করার সময় সে যে রকম চোখ কোঁচকাতো সেই রকম করে সে চোখ কোঁচকালো।

'তোমরা তো শিশু নও', সে বললো। 'তোমাদের নিজেদের সব কথা জানা দরকার। কিন্তু তার বদলে তোমরা শুধু প্রশ্ন করো। ভালো কথা, এখানে তোমাদের না-থাকার সময় আমি যদি মরে যাই আমি সে কথা ত্রাভ্‌কার কানে ফিসফিস করে বলে যাবো। ত্রাভ্‌কা।' সে ডাকলো।

একটা বিরাট বাদামী রঙের কুকুর ঢুকলো কুটিরে। কালো একটা সরু ডোরা চলে গেছে তার পিঠের উপর দিয়ে। তার প্রত্যেকটা চোখের তলায় চশমার মত কালো অর্দ্ধ-গোলাকার দাগ। এর ফলে তার চোখগুলো যতটা বড় তার চেয়ে বড় দেখায়। সেই বড় বড় চোখ দুটো যেন বললো: 'কর্তা, আমাকে ডেকেছেন কেন?'

তার দিকে আন্তিপিচ এক বিশেষ দৃষ্টিতে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা মানুষটির কথা বুঝলো: এটা বন্ধুত্বের ডাক, তার কোনো আদেশ দেবার নেই, তার সাহচর্য শুধু সে চেয়েছে, চেয়েছে তার সঙ্গে একটা ভালো তামাসা উপভোগ করতে। ত্রাভ্‌কা তার লেজ নাড়াতে লাগলো, এগিয়ে আসার সময় নীচু করলো তার শরীরটাকে এবং অবশেষে গুটিগুটি বৃদ্ধের হাঁটুর কাছে এসে চিৎ হয়ে শুলো—দেখা গেলো তার ফ্যাকাশে রঙের পেট আর ছ'জোড়া কালো স্তনবৃন্ত। তাকে চাপড়াবার জন্য আন্তিপিচ হাত তুলতে সময় পাবার আগেই সে আবার উঠে পড়ে, তার ঘাড়ের উপর সামনের দুটো থাবা চাপিয়ে চাটতে লাগলো তার নাক, গাল, এমন কি ঠোঁটগুলো।

'হয়েছে, হয়েছে', জামার আস্তিন দিয়ে নিজের মুখটা মুছতে মুছতে সে বললো কুকুরটাকে শান্ত করে।

তারপর তার মাথাটা চাপড়াতে চাপড়াতে আবার সে বললো: 'হয়েছে, এখন ফিরে যাও।'

ত্রাভ্‌কা ঘুরে চলে গেলো উঠনে।

'দেখলে তো বন্ধুরা', আন্তিপিচ বললো। 'ত্রাভ্‌কাকে দেখো, কেবলমাত্র একটা শিকারী কুকুর। আমি যা বলি সবকথা সে বোঝে আর তোমরা, বোকার দল, তোমরা শুধু

প্রশ্ন করো কোথায় সত্য আছে। বেশ, যখন সে সময় আসবে তখন এখানে আসার চেষ্টা কোরো। যদি তোমরা আমাকে না পাও, তা হলে সে সব কথা আমি ত্রাভ্‌কার কানে কানে বলে যাবো।'

একদিন আন্তিপিচ মারা গেলো। তার অল্প পরেই বিরাট স্বদেশ-প্রেমিক যুদ্ধ হোলো শুরু। তার জায়গায় আর কোনো বন-রক্ষীকে নিযুক্ত করা হোলো না। তার কুটির পড়ে রইলো শূন্য। বাড়িটা ছিলো ভারি পুরনো, আন্তিপিচের চেয়েও পুরনো। সেটার চারিদিকে ঠেকো দিতে হোলো। একদিন বাতাস কর্তাকে অনুপস্থিত দেখে ভাবলো কুটিরটার সঙ্গে সামান্য খেলবে, আর শিশুর নিশ্বেসে তাসের বাড়ি যে রকম ভেঙে পড়ে সে রকম ভেঙে পড়লো বাড়িটা। এক বছর কাটতে না কাটতেই ঘাসের সরু লম্বা ডাঁটিগুলো মাথা চাড়া দিতে লাগলো কাঠগুলোর ভিতর দিয়ে। ফাঁকা জায়গাটায় বাড়িটার বদলে শুধু পড়ে রইলো লালচে ফুলে ঢাকা ছোটো একটা ঢিবি। ত্রাভ্‌কা শীতকালে আলু রাখার গর্তে গেলো উঠে আর বুনো জন্তুদের মতো থাকতে লাগলো বনে।

কিন্তু বন্য জন্তুর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়া তার পক্ষে সহজ হোলো না। তার মহৎ আর দয়ালু প্রভু আন্তিপিচের

জন্য সে শিকার করেছে, কিন্তু কখনো নিজের জন্য করেনি। প্রায়ই শিকারে বেরিয়ে সে ধরতো খরগোশ। সেটাকে তার সামনের থাবাগুলো দিয়ে ধরে সে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতো, অপেক্ষা করতো আন্তিপিচ যতক্ষণ না আসে। যতই সে সময় খিদে পাক না কেন, কখনোই সে খরগোশটাকে খেতে সাহস করতো না। আর আন্তিপিচ কোনো কারণে যদি না আসতো তা হলে খরগোশটাকে সে দাঁতে করে তুলে, উপর দিকে মাথা করে—যাতে সেটা খুব বেশী ধাক্কা না খায়—নিয়ে যেতো বাড়ি। এই ভাবে আন্তিপিচের জন্য সে কাজ করতো, নিজের জন্য নয়। আর তার প্রভু তাকে বাসতো ভালো, দিতো খেতে আর রক্ষা করতো নেকড়েদের হাত থেকে। এখন আন্তিপিচ মারা গেছে, তাকে বাঁচতে হচ্ছে নিজের জন্য বন্য জন্তুর মতো। কোনো খরগোশকে তাড়া করার সময় মাঝেমাঝে সে ভুলে যায় যে সেটাকে তাড়া করছে আন্তিপিচের জন্য নয়, শুধু সেটাকে ধরে নিজে খাবার জন্য। মাঝেমাঝে ত্রাভ্কা বর্তমানের কথা এমন ভুলে যায় যে একটা খরগোশ ধরার পর সেটাকে সে নিয়ে যায় কুটিরে, আর ক্বচিত কখনো গাছগুলোকে আর্তনাদ করতে শুনে চলে যায় সেই ছোট্ট

ঢিবিটায়, একদা যেটা কুটির ছিলো, তার শুরু করে আর্তনাদ করতে...

'বুড়ো জমিদার' নেকড়ে সেই আর্তনাদটাকে মন দিয়ে বহুকাল থেকে শুনে আসছে।

৬

আন্তিপিচের কুটিরটা ছিলো 'শুকনো স্রোতের' কাছে। সেখানে কয়েক বছর আগে আমাদের শিকারীর দলকে চাষীরা ডেকে পাঠিয়েছিলো। স্থানীয় শিকারীরা আবিষ্কার করেছিলো যে 'শুকনো স্রোতের' কাছাকাছি কোথাও এক দল নেকড়ের বাচ্চা আছে। আমরা চাষীদের সাহায্যে গিয়ে শিকারী জন্তুদের বিরুদ্ধে লড়বার নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিলাম।

রাত্রে আমরা বুনো জলায় গিয়ে নেকড়ের চীৎকার অনুকরণ করলাম এবং প্রত্যুত্তরে 'শুকনো স্রোতের' দু'পারের সমস্ত নেকড়েদের চীৎকার পেলাম শুনতে। এইভাবে আমরা আবিষ্কার করলাম ঠিক কোন জায়গায় তারা থাকে আর সংখ্যায় তারা ক'টা। তারা থাকতো 'শুকনো স্রোতের' অনতিক্রম্য গর্তে। অতীতে এই স্রোত আর গাছগুলোর মধ্যে একটা দারুণ যুদ্ধ হয়েছিলো। স্রোতটি যুদ্ধ করেছিলো

তার স্বাধীনতার জন্য আর গাছগুলো শক্তিশালী করেছিল তীর দু'টোকে। সেদিন যুদ্ধে জিতেছিলো স্রোতটি, গাছগুলো পড়েছিলো তার উপর। কিন্তু তারপর জলটা জলায় পেঁাছে গিয়েছিলো হারিয়ে। এই সব গাছগুলো স্তরে-স্তরে পড়ে থেকে পচে গিয়েছিলো। বৃক্ষকাণ্ডের ভিতর দিয়ে ঘাস উঠেছিলো গজিয়ে আর ছোটো ছোটো ঘন আসপেন গাছের গুঁড়িগুলোকে আইভি লতা দড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে ফেলেছিলো বেঁধে। সৃষ্টি হয়েছিলো একটা শক্ত বাঁধ কিংবা, যেটাকে আমরা, শিকারীরা, বলতাম নেকড়েদের দুর্গ।

নেকড়েদের থাকার জায়গার কথা সঠিক জানতে পেরে সেটাকে ঘুরে ঝোপ থেকে ঝোপে ঝোলানো দড়িতে তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত লাল নিশানের সারি ঝুলিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটারের এক বৃত্ত রচনা করে আমরা গেলাম আমাদের স্কি'তে চড়ে। এই লাল রঙটায় নেকড়েরা ভয় পায়, ভয় পায় নতুন লাল রঙের নিশানগুলোর গন্ধে, আর বাতাস যখন বনের মধ্যে দিয়ে নিশানগুলোকে নাড়ায় তখন নেকড়েগুলো যায় ঘাবড়ে।

আমাদের বন্দুকগুলোর সংখ্যা অনুযায়ী এই বৃত্তের মধ্যে আমরা নির্গমনের পথ করলাম। প্রত্যেকটা নির্গমনের পথের সামনে ফার গাছের ঘন ডালপালার পিছনে দাঁড়িয়ে রইলো বন্দুক হাতে একজন করে লোক।

মাঝেমাঝে চীৎকার আর লাঠি ঠোকাঠুকি করে শিকার-তাড়িয়েরা নেকড়েগুলোকে জাগালো। সেগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগলো তাদের বাসস্থানের দিকে। নেকড়ে-গিন্নি আসছিলো আগে আগে, পিছনে তার বাচ্চারা, আর তাদের পাশে স্বতন্ত্রভাবে আসতে দেখা গেলো সেই বিরাট মস্ত মাথাওলা অভিজ্ঞ নেকড়েটাকে, সেই কুখ্যাত শয়তান-টাকে, চাষীরা যার নাম দিয়েছিলো 'বুড়ো জমিদার'।

নেকড়েগুলো হাঁটতে লাগলো খুব সাবধানে। শিকার-তাড়িয়েরা এসে পড়লো কাছে। নেকড়ে-গিন্নি ছুটতে শুরু করলো। আর অকস্মাৎ...

থামো! নিশান!

সে অন্য দিকে ফিরলো, কিন্তু সেখানেও আবার :

থামো! নিশান!

শিকার-তাড়িয়েরা ক্রমশ আসতে লাগলো কাছে। বুড়ি নেকড়ে-গিন্নির নেকড়ের স্বাভাবিক বুদ্ধিটা গেলো হারিয়ে। সে এলোমেলো এদিক ওদিক ছুটতে লাগলো আর অবশেষে দেখতে পেলো একটা বেরুবার পথ। কিন্তু সেখানে তার মাথায় লাগলো একটা গুলি, দশ পা'রও কম দূর থেকে ছোঁড়া।

এই ভাবে শেষ হোলো সমস্ত নেকড়েগুলো। কিন্তু এ রকম সঙ্কটে 'বুড়ো জমিদার' ইতিপূর্বেও পড়েছিলো। বন্দুকের

শব্দ শোনার পর সে সোজা লাফিয়ে গেলো নিশান সারির উপর দিয়ে। যখন সে লাফিয়ে যাচ্ছিলো দুটো গুলি ছোঁড়া হোলো তার দিকে—একটা তার বাঁ কানটা ছিঁড়ে দিলো, অন্যটা লেজের অর্দ্ধেকটা।

যদিও সেই দলটাকে মেরে ফেলা হয়েছিলো তবুও 'বুড়ো জমিদার' এক গ্রীষ্মে একলা এতোগুলো গরু আর ভেড়াকে মারলো, সমস্ত দলটা যা মারতো। সাধারণত সে কোনো জুনিপার ঝোপের পিছনে থাকতো লুকিয়ে আর অপেক্ষা করত কখন রাখালরা জন্তুর পাল ছেড়ে যায় কিংবা শুয়ে পড়ে ঘুমতে। ঠিক সময়টা বেছে নিয়ে সে পশুপালের মধ্যে আসতো ছুটে, মারতো ভেড়াগুলোকে আর জখম করতো গরুদের। তারপর একটা ভেড়াকে পিঠে ফেলে বেড়া টপকে পালাতো 'শুকনো স্রোতে', তার অগম্য বাসস্থানে। শীতকালের মাসগুলোয় ক্বচিৎ সে আসতে পারতো পশুদের গোয়ালে, তখন তার প্রধান খাদ্য হোতো কুকুরের মাংস। শেষ কালটায় সে এমন নির্লজ্জ হয়ে উঠেছিলো যে একবার বাস্তবিক একটা কুকুরকে তার প্রভুর কোল থেকে নিয়ে গিয়েছিলো ছিনিয়ে। কুকুরটা আসছিলো তার প্রভুর স্লেজের পিছন পিছন। তাকে সে তাড়া করে, আশ্রয়ের জন্য কুকুরটা লাফিয়ে ওঠে তার প্রভুর কোলে।

'বুড়ো জমিদার' হয়ে উঠেছিলো গ্রামের আতঙ্ক। চাষীরা আবার আমাদের নেকড়ে-নির্মূল দলের কাছে করলো আবেদন। পাঁচবার আমরা নিশান দিয়ে তাকে ঘেরবার চেষ্টা করলাম, পাঁচবারই সে আমাদের নিশান সারি গেলো টপকে। আর এখন দারুণ শীতের পর বসন্তের শুরুতে ঠাণ্ডায় আর ক্ষুধায় প্রায় মরতে মরতে 'বুড়ো জমিদার' তার বাসস্থানে বসে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিলো আসল বসন্তের আর গ্রাম্য রাখালদের বাঁশীর শব্দের।

যেদিন সকালে ছেলেমেয়েরা ঝগড়া করে বিভিন্ন পথ ধরলো 'বুড়ো জমিদার' সেদিন তার বাসস্থানে শুয়েছিলো খিদেয় গুমরতে গুমরতে। বাতাস যখন সকালের ঔজ্জ্বল্যকে নষ্ট করলো আর চ্যাপ্টা পাথরের পাশের গাছগুলো করে উঠলো আর্তনাদ, সে আর সহ্য করতে না পেরে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এলো। সে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে, মাথা তুলে, তার রোগা পেটটাকে কুঁচকে একটিমাত্র কান বাতাসের দিকে খাড়া করে, কাটা লেজটাকে সোজা করে শুরু করলো ডাকতে।

কী করুণই না সেই ডাকটা। পথিক, যদি যাবার সময় সেই ডাকটা তুমি শোনো আর তাতে যদি তোমার মনে দয়ার উদ্রেক হয় তা হলে করুণায় তুমি যেন গলে যেয়ো

না। যেটা তুমি শুনছো সেটা কুকুরের স্বর নয়, মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধুর। সেটা তার নিকৃষ্ট শত্রুর, নেকড়ের, যে নিজেই নিজের স্বভাবের কাছে বলি। পথিক, সামলাও তোমার সমবেদনাকে, সেটা তুমি খরচ কোরো না নেকড়ের মতো যে আর্তনাদ করে আত্ম-করুণায়। তুলে রাখো সেটা তার জন্য যে, ঐ কুকুরটার মতো প্রভুকে হারিয়ে আর্তনাদ করে, কারণ সে জানে না আর কার কাজ করবে।

৭

'শুকনো স্রোত' প্রশস্ত অর্দ্ধ-চক্রাকারে বুলুদত্ত জলাকে ঘিরে রয়েছে। তার এক দিকে চিৎকার করছিলো কুকুরটা, অন্য দিকে নেকড়েটা। বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো গাছগুলোর উপর, আর তাদের বিলাপকে নিয়ে যাচ্ছিলো এদিক ওদিক। কে যে ডাকলো সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই। বাতাস গ্রাহ্যই করে না কোথা থেকে বিলাপ আর ক্রন্দনধ্বনি আসছে— গাছ, মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু কুকুর, কিংবা তার জঘন্যতম শত্রু নেকড়ের কাছ থেকে। বয়ে বেড়াবার জন্য শব্দটা থাকলেই হোলো। বিশ্বাসঘাতক বাতাস প্রভু পরিত্যক্ত কুকুরটার করুণ বিলাপধ্বনিকে নিয়ে গেলো নেকড়েটার

কানে। আর 'বুড়ো জমিদার' গাছগুলোর বিলাপ থেকে কুকুরের চীৎকারের পার্থক্যটা বুঝতে পেরে নিঃশব্দে তার বাসস্থান ছেড়ে, তার একটিমাত্র কান খাড়া আর কাটা লেজটাকে শক্ত করে উঠলো একটা ঢিবির উপর। এই সুবিধেজনক জায়গা থেকে সে আবিষ্কার করলো যে ডাকটা আসছে আন্তিপিচের বাসস্থানের কাছ থেকে। এই ঢিবি থেকে সোজা সে ছুটলো সেই দিকে।

ত্রাভ্কার সৌভাগ্য যে খুব ক্ষুধার্ত ছিলো বলে সে তার করুণ বিলাপকে চালিয়ে যেতে পারলো না, যা দিয়ে হয় সে তার নিয়তির জন্য দুঃখ জানাচ্ছিলো কিংবা আহ্বান করছিলো কোনো নতুন প্রভুকে তার কাছে আসতে। হয়তো সে তার কুকুরের বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিলো যে আন্তিপিচ মরে যায়নি, শুধু মুখ ঘুরিয়েছে তার দিক থেকে। সম্ভবত তার কাছে সমস্ত মনুষ্য জাতি হোলো একটিমাত্র আন্তিপিচ, যাদের মুখগুলো বিভিন্ন। আর যদি সে তার একটি মুখ ফেরায় হয়তো অন্য মুখওলা সেই একই আন্তিপিচ শীঘ্রই তাকে ডাকবে আর তখন সে এই নতুন আন্তিপিচের সেবা করবে সেই রকম বিশ্বাসীভাবে, যে ভাবে পুরনো আন্তিপিচের সেবা সে করতো ...

হ্যাঁ, সম্ভবত ব্যাপারটা এই রকমই ছিলো: ত্রাভ্কা প্রাণপণে ডাকছিলো তার আন্তিপিচকে।

আর নেকড়েটা মানুষের জন্য কুকুরটার ঘৃণিত প্রার্থনা শুনে যেদিক থেকে সেটা আসছিলো সেদিকে চললো ছুটে। যদি আর পাঁচ মিনিট ধরে কুকুরটা চীৎকার করতো 'বুড়ো জমিদার' তা হলে ধরে ফেলতো তাকে। কিন্তু আন্তিপিচের জন্য প্রার্থনা উচ্চারণ করার পর সে ক্ষুধার দারুণ জ্বালা অনুভব করে আন্তিপিচকে ডাকা থামিয়ে বেরুলো খরগোশের গতিপথ খুঁজতে।

সেটা বছরের সেই সময় যখন রাত্রিচর খরগোশরা দিনের প্রথম চিহ্ন দেখে শুয়ে পড়ে না, সারা দিন চোখ তাকিয়ে ভয়ে অপেক্ষা করে থাকে না রাত্রির জন্য। বসন্তকালে খরগোশরা খেতে, পথেঘাটে দিনের বেলাতেও নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই ভাবে যেখানে ছেলেমেয়েরা ঝগড়া করে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো সেইখানে এলো এক বুড়ো খরগোশ আর তাদের মতোই চ্যাপটা পাথরে বসলো বিশ্রাম করতে ও কান পেতে শুনতে। এক আকস্মিক বাতাসের ঝাপটা তার কানে নিয়ে এলো গাছগুলোর বিলাপধ্বনি। সে এমন ভয় পেয়ে উঠলো যে চ্যাপটা পাথর থেকে লাফিয়ে পিছনের পাগুলো সামনের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে খরগোশের রীতি অনুযায়ী ছুটে চললো 'অন্ধ জলার' দিকে, মানুষের পক্ষে যেটা দারুণ বিপজ্জনক। তখনো তার লোম ছড়াবার

সময় চলছে। মাটির উপর সে শুধু তার রোঁয়াগুলো রেখে যাচ্ছিলো না, ঝোপ আর গত বছরের ঘাসের বোঁটার উপর ফেলে যাচ্ছিলো তার শীতকালের লোমের সামান্য সামান্য অংশ।

যদিও পাথরটা ছেড়ে বেশ খানিক্ষণ আগে খরগোশটা গিয়েছিলো ত্রাভ্কা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পেলো তার গন্ধ। সে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে খরগোশটাকে তাড়া করল না, কারণ সেই চ্যাপ্টা পাথরে দুটি ছোটো ছোটো মানুষের আর সেই সঙ্গে তাদের ঝুড়ির রুটি আর আলুর গন্ধও পড়েছিলো।

ত্রাভ্কা এক জটিল সমস্যায় পড়লো — 'অন্ধ জলার' দিকে খরগোশের যে গন্ধটা আর ঐ দুটি ছোটো মানুষের মধ্যে একটির যে পায়ের ছাপ গেছে সে কি সেগুলিকে করবে অনুসরণ, নাকি অনুসরণ করবে 'অন্ধ জলাকে' ঘুরে ডান দিকে মানুষের যে গন্ধটা গেছে সেটাকে?

ছোটো ছোটো মানুষদের মধ্যে কে রুটি নিয়ে গিয়েছে সে কথা ত্রাভ্কা বুঝতে পারলে সহজেই আপনা থেকে সমস্যাটার সমাধান হয়ে যেতো। সেই রুটিটায় শুধু যদি একটা কামড় সে দিতে পারতো তা হলে খরগোশটার পথ ধরে সে করতে পারতো তাড়া আর সেটাকে ধরে নিয়ে আসতো তার কাছে যে তাকে রুটিটা দিয়েছে।

কোথায় সে যাবে, কোন পথ সে ধরবে?

মানুষ কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে ভাববার জন্য থামে, কুকুরদের অনুরূপ অবস্থার জন্য শিকারীরা একটা বিশেষ কথা সৃষ্টি করেছে।

তাই যে কোনো শিকারী কুকুর তার অবস্থায় পড়লে যা করতো ত্রাভ্‌কাও তাই করলো। শূন্যে মাথা তুলে সে ঘুরপাক খেতে লাগলো, উপর থেকে নীচে, বাঁ থেকে ডাইনে নাড়াতে লাগলো তার নাকটাকে, তার চোখে বুদ্ধিদীপ্ত একাগ্রতা।

যেদিকে নাস্তিয়া গেছে সেদিক থেকে বয়ে আসা বাতাস ত্রাভ্‌কার ঘুরপাক খাওয়া আচমকা বন্ধ করলো। মুহূর্তের জন্য নিশ্চল হয়ে থেকে সে খরগোশের মতো দাঁড়ালো পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে।

আন্তিপিচ যখন বেঁচেছিলো তখন এ ধরনের একটা ঘটনা ঘটে।

বনে কাঠ মাপার এক শক্ত ধরনের কাজে নিযুক্ত ছিলো বন-রক্ষী। ত্রাভ্‌কা যাতে তার অসুবিধে করতে না পারে সেই জন্য আন্তিপিচ তাকে কুটিরের কাছে রেখেছিলো বেঁধে। বন-রক্ষী ফরসা হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে খুব সকাল সকাল পড়েছিলো বেরিয়ে। কিন্তু দুপুরের খাবার সময়েই ত্রাভ্‌কা

জানতে পারে যে শিকলটার অন্য প্রান্তটা একটা লোহার হুকের সঙ্গে বাঁধা। সে হুকটা আঁটা ছিলো একটা মোটা দড়ির সঙ্গে। সেটা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ির চাতালের উপর ওঠে, তারপর পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের থাবাগুলো দিয়ে সে নিজের দিকে টেনে আনে দড়িটা আর সন্ধের দিকে দড়িটাকে ফেলে কেটে। তারপর সে বেরিয়ে পড়ে আন্তিপিচের খোঁজে, শিকলটা ঝুলতে থাকে তার কলারের সঙ্গে। আন্তিপিচ যাবার পর বার ঘণ্টার বেশী গেছে কেটে, গন্ধটা গেছে হারিয়ে, চিহ্নগুলো ধুয়ে গেছে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে—সেটা বৃষ্টি না বলে শিশির বলা যায়। কিন্তু অরণ্যের ভিতরটা এতো স্তব্ধ যে বাতাস সেখানে নড়েনি। আন্তিপিচের পাইপের অস্পষ্ট তামাকের গন্ধ সেখানে লেগেছিলো সকাল থেকে। ত্রাভ্কা চট করে বুঝতে পারে যে আন্তিপিচের পায়ের ছাপ শুঁকে তাকে খুঁজে বার করার আশা নেই। তাই সে মাথা তুলে বাতাসে নাক ঘুরিয়ে অকস্মাৎ পায় এক ঝলক তামাকের গন্ধ, এবং ক্রমশ কখনো গন্ধটাকে হারিয়ে, কখনো আবার সেটাকে পেয়ে, সে অবশেষে পৌঁছয় তার প্রভুর কাছে।

সেই অভিজ্ঞতার কথা এখন তার মনে পড়লো। যখন অকস্মাৎ জোরালো বাতাসের ঝাপটায় সেই সন্দেহজনক

গন্ধটা এলো তার নাকে, মুহূর্তের জন্য একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো। পরের ঝাপটা যখন এলো তখন সেবারকার মতো সে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো খরগোশের মতো, আর মনস্থির করে ফেললো: বাতাস যেদিক থেকে বইছে সেদিকে ছোটো ছোটো মানুষদের একটির সঙ্গে রুটি আর আলু হয়েছে অদৃশ্য।

বাতাস যে গন্ধটা এনেছে সেটার সঙ্গে ঝুড়িটা যে গন্ধ ফেলে গেছে সেটাকে তুলনা করার জন্য ত্রাভ্কা ফিরে গেলো চ্যাপ্টা পাথরটার কাছে। তারপর অন্য ছোটো মানুষ আর খরগোশটা যে গন্ধটা ফেলে গিয়েছিলো সেটাকে আর একবার সে শুঁকলো। নিশ্চয়ই মনে মনে এই রকম যুক্তি সে করেছিলো:

'খরগোশটা তার দিনের বাসস্থানে সোজা গিয়েছে, নিশ্চয়ই রয়েছে ''অন্ধ জলার'' কাছাকাছি কোথাও, আর জমিয়ে বসেছে সমস্ত দিনের জন্যে—সে পালাবে না। কিন্তু যে লোকটার কাছে রুটি আর আলু রয়েছে সে পারে উধাও হতে। তা ছাড়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খরগোশটাকে ধরা, সেটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে একলা একলা খাওয়া আর মানুষের কাছ থেকে রুটি ও সদয় ব্যবহার পাওয়া, হয়তো এমন কি তার মধ্যে আন্তিপিচকে আবিষ্কার করা—এই দুটোর মধ্যে কোনো তুলনা হয় না।'

'অন্ধ জলার' দিকে যে পায়ের দাগ সোজা চলে গেছে সেদিকে আর একবার তাকিয়ে, ডান দিকের যে পথটা জলাটাকে প্রদক্ষিণ করে গেছে সেই পথের দিকে মুখ ঘোরালো ত্রাভ্‌কা, তারপর আর একবার পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, নিশ্চিত হয়ে একবার লেজ নাড়িয়ে সেই পথ দিয়ে সোজা ছুটে চললো।

৮

'অন্ধ জলাটা', কম্পাসের কাঁটা অনুসরণ করে মিতিয়া যে দিকে গিয়েছিলো সেটা এক বিপদসঙ্কুল স্থান। বহু লোক সেখানে ডুবেছিলো, গরু আর ভেড়ার কথা তো ছেড়েই দেওয়া যায়। 'অন্ধ জলাটা' যে কী রকম সে কথা না জেনে নিশ্চয়ই কারুর ব্লুদভ জলায় যাওয়া উচিত নয়।

ইন্ধনের বিরাট সম্পদশালী ব্লুদভ জলাকে আমরা যে ভাবে দেখতে পাই, সেটা সূর্যের ধনাগার। হ্যাঁ, ঠিক তাই। গরম সূর্য সেই জলার উৎপন্ন প্রত্যেকটি ঘাস, প্রত্যেকটি ফুল, প্রত্যেকটি ঝোপ আর বেরির মা। তাদের প্রত্যেককে সূর্য দেয় তার উষ্ণতা, আর তারা প্রত্যেকে মরে গিয়ে, পচে, সার হয়ে এই উষ্ণতাকে দিয়ে যায় তাদের জায়গায় জন্মানো নতুন ঘাস, ফুল আর

বেরিগুলোকে। কিন্তু জলাজমির জল উদ্ভিদ পিতা-মাতাদের সমস্ত ঐশ্বর্য তাদের সন্তানদের দিয়ে যেতে দেয় বাধা। হাজার হাজার বছর ধরে এই ঐশ্বর্য জমতে থাকে জলের নীচে, এইভাবে জলাটা হয়ে ওঠে সূর্যের ধনাগার। তারপর সমস্ত পীটের * উত্তরাধিকারী হয় মানুষ।

ব্লুদভ জলায় ইন্ধনের বিরাট সম্পদ আছে, কিন্তু পীটের স্তরগুলো সর্বত্র সমান পুরু নয়। চ্যাপ্টা পাথরের পাশে, ছেলেমেয়েরা যেখানে বসেছিলো, সেখানে হাজার হাজার বছর ধরে পচে-যাওয়া উদ্ভিদরাশি একটির উপর একটি করে বিছিয়ে রয়েছে স্তরের পর স্তর। সবচেয়ে পুরনো পীটের স্তর এখানে রয়েছে, কিন্তু আরো দূরে, 'অন্ধ জলার' দিকে, স্তরগুলো আরো নতুন আর পাতলা।

কম্পাসের কাঁটাটা অনুসরণ করে ধীরে ধীরে মিতিয়া এগুতে লাগলো আর পথটা, তার পায়ের নীচের ছোট ছোট ঢিবিগুলো, এ পর্যন্ত যেগুলো শুধু নরম ছিলো, হয়ে উঠলো কাদায় ভরা। যেটাকে শক্ত মাটি বলে মনে হয় সেটার উপর সে ফেলে পা, আর পা'টা যায় ডুবে। আতঙ্কিত

---

* পীট — জলাজমির যে উদ্ভিদগুলো ঘন হয়ে জমে উঠে ইন্ধন সৃষ্টি করে।

হয়ে নিজেকে সে প্রশ্ন করে: তার পা'টা কি কোনো গভীর খাদে পড়েছে? কতকগুলো ঢিবি এমন টলমলে যে সেগুলোর উপর পা ফেলার আগে তাকে ভাবতে হয় ভালো করে। তারপর এমন ঘটনাও ঘটে যে সে পা ফেললো আর সঙ্গে সঙ্গে তার নীচে শোনা গেলো একটা গুড়গুড় শব্দ, মাঝেমাঝে লোকের যে রকম পেট ডাকে সে রকম। এই গুড়গুড় শব্দটা ক্রমশ জলার মধ্যে মিলিয়ে যায়।

এখন তার পায়ের তলার মাটিটা একটা দোলনার মতো। সেটাকে পাঁক ভরা এক গভীর গর্তের উপর হয়েছে টাঙিয়ে দেওয়া। এই নড়বড়ে জমিতে পরস্পর জড়িত শিকড় আর উদ্ভিদের বোঁটাগুলোর পাতলা স্তরের উপর বেঁটে-বেঁটে, রোগা-রোগা ফার গাছ জন্মেছে। জলা মাটির অম্ল রসের জন্য তারা আর লম্বা হতে পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ছোটো ছোটো গাছগুলোর বয়স সম্ভবত এক শ' বছর, সম্ভবত আরো বেশী... এই ডাইনি ফার গাছগুলো দেখতে অরণ্যের গাছের মতো লম্বা, ছিপছিপে নয়—দেখতে নয় স্তম্ভ কিংবা মোমবাতির মতো। জলার ডাইনির বয়স যত বেশী তত অদ্ভুত তার চেহারাটা। ওখানকার ওই গাছটা তার একটা শূন্য ডাল উঁচিয়ে রয়েছে, যেন একটা হাত ভয় দেখাচ্ছে ধরবে বলে; আর একটা

হাতে ধরে রয়েছে একটা লাঠি, তার কাছে এলেই মারবার জন্য সে প্রস্তুত; তৃতীয়টা কী জানি কী কারণে রয়েছে গুঁড়ি মেরে বসে; আর অন্য একটা বুনছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকটাই এমন এক-এক ধরনের যে সেটা যেন শুধুই একটা গাছ নয়।

মিতিয়ার পায়ের নীচের পীটের স্তর ক্রমশ এলো পাতলা হয়ে। কিন্তু পরস্পরসংলগ্ন উদ্ভিদের শিকড়গুলো নিশ্চয়ই ছিলো মানুষের ভার সহ্য করার মতো মজবুত। কারণ প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মিতিয়া উঠছিলো দুলে, তার সঙ্গে তার চারিদিকের বহু দূর পর্যন্ত সবকিছুও দুলছিলো। দুলতে দুলতে সে চললো ক্রমশ এগিয়ে। যে লোকটি তার আগে এই পথ দিয়ে গিয়েছে, এবং এমন কি পায়ে চলা একটা পথ গেছে করে—তার উপর শুধু আস্থা রাখাই হোলো মিতিয়ার এক মাত্র কাজ।

এই ছোটো ছেলে, তার বড় বন্দুক এবং হাঁ-করা টুপি দেখে মনে হোলো ডাইনি ফার গাছগুলো দারুণ অস্বস্তি পেয়েছে। প্রায়ই তাদের এক একজন দাঁড়াচ্ছে ডিঙি মেরে, যেন সে এই ধৃষ্ট পথিকের মাথায় চায় লাঠি মারতে। সেই সঙ্গে সে আড়াল করছে অন্য সব ডাইনিদের। তারপর পিছন দিকে আবার সে হেলে পড়ে এবং আর একটা ডাইনি

তার কঙ্কালের হাতটা তুলে ধরে পথটার দিকে। মনে হয় আর এক পা গেলেই ফাঁকা জায়গাটা যাবে খুলে আর তার মাঝখানে দেখা দেবে একটা ডাইনির কুটির, চারিদিকে বেড়া, বেড়ার খুঁটিগুলোর উপর মানুষের মাথার খুলি।

ছোটো বনে যে কালো কাকটা তার বাসাটাকে পাহারা দিচ্ছিলো জলার উপর চক্রাকারে ঘুরে, সে হাঁ-করা টুপি-পরা ক্ষুদে শিকারীকে পেলো দেখতে। অন্যান্য পাখীদের মতো কাকেরও আছে একটা বিশেষ ধরনের বসন্তের ডাক। সেটাকে মানুষে খানিক অসম্পূর্ণভাবে নকল করতে পারে ঘড়ঘড়ে নাকি সুরে 'ড্রুঙ্-টঙ্' বলে। প্রধান শব্দের সঙ্গে তার আছে একটা সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য। সেটা কানে যায় না। তার ফলে আমরা বুঝতে পারি না কাকেরা কী বলছে, কালা-বোবার মতো আমরা শুধু করতে পারি অনুমান।

'ড্রুঙ্-টঙ্!' বলে পাহারাদার কাকটা ডেকে উঠলো। সে জানালো যে একটা ক্ষুদে লোক হাঁ-করা টুপি পরে আর বন্দুক নিয়ে এগিয়ে আসছে 'অন্ধ জলাটার' দিকে। এ কথা জানালো যে খানিক খাদ্য আশা করা যায়।

'ড্রুঙ্-টঙ্।' কাক-গিন্নি উত্তর দিলো তার বাসা থেকে। এর দ্বারা সে বলতে চাইলো:

'আমি শুনতে পেয়েছি, আর অপেক্ষা করছি।'

হাঁড়িচাঁচা কাকের নিকট আত্মীয়। ডাকাডাকি শুরু হয়েছে শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা শুরু করলো চেঁচাতে। এমন কি খ্যাঁকশেয়ালটাও কাকের ডাকে কান খাড়া করলো। সবে সে নিষ্ফল ইঁদুর-শিকার থেকে ফিরেছে।

মিতিয়া এর সবটাই শুনলো কিন্তু একটুও ভয় পেলো না — মানুষের পা যে পথ তৈরী করেছে সেই পথ ধরে কি সে হাঁটছে না? তারই মতো একজন লোক আগে সেখানে ছিলো, মিতিয়া তাই সেটা নির্ভয়ে করতে পারে অনুসরণ। কাকের ডাক শুনে সে এমন কি সাহস করে একটা গান ধরলো :

'পাক খেয়ো না কালো কাক, আমার মাথার ওপরে।'

গানটা গেয়ে সে প্রফুল্ল হয়ে উঠলো আর ভাবলো দীর্ঘ কষ্টকর পথে না গিয়ে একটা সোজা পথ ধরবে। নীচের দিকে তাকিয়ে সে দেখলো প্রতিবার পা ফেলার পর যে গর্তটা হচ্ছে সেটা ভরে যাচ্ছে জলে। যে সব লোক আগে এখান দিয়ে গিয়েছে তাদের পায়ের চাপ শ্যাওলা-ঢাকা উপরিভাগ থেকে জলকে খানিকটা নীচে দিয়েছে দাবিয়ে, ফলে পথটা হয়ে গেছে ছোট্ট একটা স্রোত আর তার দু' পাশের শুকনো তীরে জন্মেছে দীর্ঘ দীর্ঘ মিষ্টি মিষ্টি

ঘাস। সেগুলো এক ধরনের বীথিকা সৃষ্টি করেছে। এই ঘাসগুলোর রঙ জলার বাদবাকি অংশের বসন্তকালীন উদ্ভিদের মতো হলদে নয়। সেটার রঙ শাদা। ফলে সামনে অনেক দূর পর্যন্ত মানুষের পায়ে চলা আঁকাবাঁকা পথটাকে দেখা সম্ভব। মিতিয়া দেখলো দূরে একেবারে অদৃশ্য হবার আগে এই পথটা হঠাৎ বেঁকেছে বাঁয়ে। কম্পাস বার করে সে আবিষ্কার করলো: কাঁটা উত্তর দিককে দেখাচ্ছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে পথটা গেছে পশ্চিমে।

'চি-ভি?' টিটিভ প্রশ্ন করলো।

'আমি, আমি।' কাদা-খোঁচা দিলো উত্তর।

'ড্রুঙ্‌-টঙ্‌!' আগের চেয়ে বেশী আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে কাকটা চেঁচিয়ে বললো।

আর চারিদিকের বেঁটে বেঁটে ফার গাছ থেকে হাঁড়িচাঁচারা প্যাঁকপ্যাঁক করে উঠলো।

চারিদিকে চেয়ে মিতিয়া সামনে দেখতে পেলো একটা পরিষ্কার নিরাপদ চেহারার ফাঁকা জায়গা। সেখানে ঢিবিগুলো ক্রমশ নীচু হয়ে আসতে আসতে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমতল জমি সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যেটা আরো প্রয়োজনীয়, ফাঁকা জায়গাটার ওপাশের খুব কাছে সে দেখতে

পেলো সেই দীর্ঘ দীর্ঘ শাদা শাদা ঘাসগুলোকে, মানুষের পায়ে-চলা পথের বিশ্বাসী বন্ধুকে। এই ঘাসের গতি-পথ দিয়ে সেই পথটাকে সে আবিষ্কার করলো। সেটা উত্তর দিকে সোজা যায়নি। মিতিয়া মনে মনে ভাবলো: 'যখন খুব কাছেই, ফাঁকা জায়গাটার একটু ওপাশেই একটা পথ দেখতে পাচ্ছি, তখন কেন আমি বাঁ দিকে মোড় নিয়ে একটার পর একটা ঢিবির ওপর দিয়ে যাবো?'

মসৃণ ফাঁকা জায়গাটার উপর দিয়ে সে চলে গেলো নির্ভয়ে।

জলার উপর দিয়ে হাঁটার চেয়ে প্রথম প্রথম 'অন্ধ জলার' উপর দিয়ে হাঁটা মিতিয়ার পক্ষে এমন কি সহজই হয়েছিলো। কিন্তু ক্রমশ তার পাটা ডুবতে লাগলো বেশী গভীর হয়ে, এবং সেটাকে টেনে বার করা হয়ে উঠতে লাগলো কঠিন থেকে কঠিনতর। কোনো এল্‌ক'এর (বড় হরিণ) পক্ষে এ জায়গাটা ভালোই হোতো। কোনো দুর্ভাবনা না করে তার লম্বা শক্তিশালী পায়ে অরণ্যের মধ্যে যেমন দ্রুতবেগে সে দৌড়তে পারে, বাদার উপর দিয়েও তেমনি দ্রুতবেগে পারে দৌড়তে। মিতিয়া কিন্তু এখন বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ায় ভাববার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লো। যে মুহূর্তে সে থামলো তার

পাটা ডুবে গেলো হাঁটু পর্যন্ত, আর পরের মুহূর্তে পাঁকটা উঠলো আরো উঁচুতে। এখনো সে বাদা থেকে নিজেকে টেনে তোলার চেষ্টা করে সে পারতো ফিরে যেতে। জলার উপরিভাগে তার বন্দুকটা রেখে তার উপর ভর দিয়ে সে বাস্তবিকই ভাবলো ফিরে যাবে বলে। কিন্তু তারপর মাত্র কয়েক পা আগে আবার সে দেখতে পেলো সেই দীর্ঘ শাদা শাদা ঘাস যেগুলো মানুষের পথ অনুসরণ করে গেছে। 'আমি এক লাফে ওখানে যাবো!' সে বললো।

আর তারপর সে দিলো এক হ্যাঁচকা টান।

কিন্তু তখন খুব দেরী হয়ে গেছে। যে আহত লোক নিজেকে বলে যে সে মরতে পারে মাত্র একবারই, তার মতো মরীয়া হয়ে সে দিলো আর একটা হ্যাঁচকা টান, তারপর আর একটা, তার পর আরো একটা। তারপর অনুভব করলো যে বুক পর্যন্ত এক বজ্রমুষ্টিতে সে ধরা পড়েছে। এখন সে এমন কি গভীরভাবে নিশ্বেস টানতে পারলো না, কারণ সামান্যতম নড়াচড়া করলেই সে আরো ডুবে যেতে লাগলো। বাদার উপরিভাগে বন্দুকটাকে শুইয়ে রেখে তার উপর দু'হাতের ভর দিয়ে তার দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসকে থামাবার চেষ্টা করা ছাড়া করার আর কিছু নেই। তাই সে

করলো : সে তার কাঁধ থেকে বন্দুকটা খুলে সামনে রেখে দু'হাত দিয়ে ভর দিল তার উপর।

অকস্মাৎ এক বাতাসের ঝাপটায় নাস্তিয়ার তীক্ষ্ণ চীৎকার সে শুনতে পেলো :

'মিতিয়া-আ-আ-আ !'

চেঁচিয়ে সে উত্তর দিলো।

কিন্তু নাস্তিয়া যেখানে দাঁড়িয়ে বাতাস বইছিলো সেদিক থেকে। সেটা তার চীৎকারকে পশ্চিমে, ব্লুদভ জলার অন্য প্রান্তে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো যেখানে সংখ্যাহীন খর্বকায় ফার গাছ ছাড়া আর কিছু নেই। হাঁড়িচাঁচারা শুধু এক ফার গাছ থেকে অন্য ফার গাছে উড়ে যেতে যেতে, 'অন্ধ জলার' উপর চক্রাকারে উড়তে উড়তে আর তাদের স্বভাবসুলভ উত্তেজিত কিচিরমিচির করতে করতে, ফার গাছের উপরকার ডালে বসে, লম্বা লেজ আর লোমশ চেহারা নিয়ে উত্তর দিলো নিম্নোক্ত চীৎকার করে :

'ড্রি-টি-টি !' আর 'ড্রা-টা-টা।' এদিকে মাথার উপর থেকে কাকটা ডাকতে লাগলো :

'ড্রুঙ্-টুঙ্।'

হাঁড়িচাঁচা তাড়াতাড়ি বিপদ বুঝতে পারে। তারা বাদায় ডুবন্ত ছোটো মানুষটির চরম অসহায় অবস্থাটা পারলো বুঝতে।

ফার গাছের উপর থেকে দ্রুত উড়ে এসে, জমির উপর নেমে, চতুর্দিক থেকে তারা তার দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে আসতে লাগলো হাঁড়িচাঁচাদের প্রথা মতো আক্রমণ করতে।

হাঁ-করা টুপি-পরা ছোটো মানুষটি চীৎকার করা বন্ধ করলো।

তার রোদ-পোড়া গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ঝকঝকে অশ্রু-ধারা।

৯

যে লোক কখনো ক্রানবেরি ফলতে দেখেনি জলার মধ্যে সে অনেক সময় ধরে চলে যেতে পারে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে, তারপর লক্ষ্য করে যে সে বেরি মাড়িয়ে চলছে। বিলবেরির বেলায় অবশ্য একেবারে আলাদা কথা। কেমন করে তারা ফলে সেটা দেখা যায়: ডানার মতো চারিদিকে ছোটো ছোটো সবুজ পাতা নিয়ে একটি সরু বৃন্ত উপরে উঠেছে, আর ছোটো ছোটো রূপালি-নীল বেরিগুলি ফলে আছে পাতাগুলির গা ঘেঁষে। কিংবা দেখা যায় হট্‌ল্‌বেরি, রক্তের মতো লাল, ঘন শক্ত পাতাগুলো গাঢ় সবুজ রঙের। সেগুলো এমন কি তুষারের চাপেও হলদে হয়ে যায় না, আর বেরিগুলো এতো অজস্র যে মনে হয়

মাটিটা বুঝি ভিজে গেছে রক্তে। তাছাড়া আছে নীল বিলবেরি। সেগুলোও জলার উদ্ভিদ। জন্মায় সেগুলো ছোটো ছোটো ঝোপে। বেরিগুলো হালকা নীল রঙের, বেশ বড়সড়। সেগুলোকে লক্ষ্য না করে তুমি পারবে না। গহন অরণ্যে, যেখানে বড় বন্য-কুক্কুটরা থাকে, চুণি রঙের বেরিগুলো জন্মায় থোকা থোকা। প্রত্যেকটা চুণিই সবুজ কাঠামোর উপর বসানো। বেরিদের মধ্যে শুধু ক্রানবেরিরাই, বিশেষ করে প্রথম বসন্তে, জলার ঢিবিগুলোর মধ্যে থাকে লুকিয়ে। সেখানে উপর থেকে প্রায় তাদের দেখাই যায় না। শুধু এক জায়গায় যেখানে অনেক বেরি আছে সেখানে সেগুলোকে তুমি দেখতে পাবে উপর থেকে আর তারপর ভাববে: 'কেউ নিশ্চয়ই ক্রানবেরি ছড়াতে ছড়াতে গেছে'। তুমি নীচু হবে একটা বেরি চাখবার জন্য, আর তখন তুমি বেরিতে-ঢাকা সবুজ বৃন্তটা ফেলবে টেনে তুলে। তখন তুমি বড় বড়, রক্তের মতো লাল বেরির একটা গোটা নেকলেস পারো তুলে ফেলতে।

কোনো কারণে—হয়তো বসন্তকালে বেরিগুলো খুব দুর্মূল্য বলে, কিংবা হয়তো সেগুলো ভারি উপকারী ও খুব আরোগ্য-সাধক বলে, কিংবা হয়তো চায়ের সঙ্গে খুব সুস্বাদু বলে—লোকেরা যেন সেগুলো তোলা থামাতে পারে না। ক্রমাগত তারা তুলে যায় পাগলের মতো। আমাদের

গ্রামে একদা এক বৃদ্ধা থাকতো। বেরি দিয়ে সে তার ঝুড়িটা এমন ভারি করে ফেলেছিলো যে সেটা তুলতে পারেনি। কিন্তু প্রাণ ধরে সে পারেনি কোনো বেরি ফেলে দিতে কিংবা ঝুড়িটাকে ফেলে যেতে। তাই যতদিন না মরে ততদিন সে ছিলো তার ঝুড়িটার পাশে।

মাঝে মাঝে কোনো স্ত্রীলোক বেরি-ভরা একটা জায়গা আবিষ্কার করে। কাছাকাছি কেউ আছে কিনা দেখার জন্য তাড়াতাড়ি একবার চারিদিকে তাকিয়ে নেয়। তারপর জলাজমির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে যায় সেগুলোর দিকে।

যেখানেই লাল বেরি দেখছিলো, প্রথম প্রথম নাস্তিয়া প্রত্যেকটা বেরিকে তুলছিলো তার বৃন্ত থেকে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে একটি বেরির জন্য নীচু হওয়া থামালো — একই সঙ্গে আরো বেশী পেতে সে চায়।

ইতিমধ্যেই সে বুঝতে পাচ্ছিলো একটা না, দুটো না, পুরো এক মুঠো বেরি রয়েছে কোনো বৃন্তে। যখন একমুঠো পাবার সম্ভাবনা তখনই কেবল সে হচ্ছিলো নীচু। মুঠো মুঠো সেগুলোকে সে ফেলছিলো তার ঝুড়িতে আর প্রতিটি আবিষ্কারের সঙ্গে সে হয়ে উঠছিলো আরো বেশী উৎসুক।

বাড়িতে কাজ করার সময় নাস্তিয়ার এমন একটা ঘণ্টাও কাটতো না যখন সে ভাবতো না তার ভাইয়ের কথা কিংবা

তার ভাইকে ডাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো না। কিন্তু এইবার, যখন ভগবানই জানেন সে কোথায় রয়েছে একেবারে একলা, নাস্তিয়ার এমন কি মনেও পড়লো না যে তার কাছে রয়েছে সবটা খাবার; মনে পড়লো না যে তার প্রিয় ভাইটি না খেয়ে অন্ধকার জলার কোনোখানে বেড়াচ্ছে ঘুরে। নিজের সম্বন্ধেও সে ভাবছিলো না। সে শুধু ভাবছিলো ক্রানবেরির কথা আর সেগুলোকে সে চাইছিলো আরো বেশী করে।

ভালো পায়ে-চলা পথটাকে অনুসরণ করতে চেয়েছিলো বলে ভাইয়ের সঙ্গে সে করেছিলো ঝগড়া। কিন্তু এখন ক্রানবেরিগুলোর পিছন পিছন এসে নাস্তিয়া এমন কি লক্ষ্যই করলো না যে সে নিজেই ছেড়ে দিয়েছে ভালো পায়ে-চলার পথ।

এক সময় তার ঘোর কাটলো আর অকস্মাৎ বুঝতে পারলো যে সে পথ ছেড়ে এসেছে। যেখানে তার মনে হোলো পথটা থাকার কথা সে জায়গায় সে গেলো। কিন্তু কোনো পথ নেই সেখানে। তারপর অন্য দিকে সে গেলো ছুটে। সেখানে দুটো শুক্ন গাছ তাদের নিরাবরণ ডালগুলো রয়েছে উঁচিয়ে—সেখানেও কোনো পথ নেই। নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে কম্পাসটাকে আর মিতিয়া সেটা সম্বন্ধে কী বলেছিলো সে কথাগুলোকে তার মনে পড়ার কথা, মনে পড়ার কথা তার

স্নেহের ভাই মিতিয়াকে—একলা একলা যে ক্ষুধার্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তাকে মনে পড়ায় চেঁচিয়ে তাকে ডাকার কথা ...

নাস্তিয়া নিশ্চয়ই তার কথা ভাবতো যদি না ঠিক সেই মুহূর্তেই এমন একটা দৃশ্য দেখতো যেটা কোনো ক্রানবেরি-পাগলই সমস্ত জীবনে দেখতে পায় না ...

ছেলেমেয়েরা তর্ক করেছিলো কোন পথে যাবে। তারা জানতো না যে ছোটো আর বড় দু'টো পথই 'অন্ধ জলাকে' প্রদক্ষিণ করেছে আর মিলেছে 'শুকনো স্রোতের' কাছে এবং সেখান থেকে এক হয়ে অবশেষে পৌঁচেছে পেরেয়াস্লাভ্‌ল্ রাজপথে। নাস্তিয়ার পথ ছিলো শুকনো জমির উপর। সেটা আরো বড় অর্ধ-চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করেছে 'অন্ধ জলাকে'। মিতিয়া 'অন্ধ জলার' একেবারে ধার দিয়ে সোজা গিয়েছিলো। যদি এক মুহূর্তের জন্যও দীর্ঘ শাদা ঘাসকে চোখের আড়াল করার মারাত্মক ভুল না করতো তা হলে নাস্তিয়া যেখানে পৌঁচেছিলো মিতিয়া তার অনেক আগেই পৌঁছতো ঠিক সেই জায়গায়। আর জুনিপার ঝোপের আড়াল করা এটাই সেই জায়গাটা—সেই 'প্যালেস্টাইন'—যেখানে কম্পাসের কাঁটাকে অনুসরণ করে মিতিয়া আশা করেছিলো পৌঁছবে।

কিন্তু মিতিয়া যদিই বা সেখানে পৌঁছতো তা হলে এই রক্তের মতো লাল রঙের 'প্যালেস্টাইনে' ক্ষুধার্ত অবস্থায় আর ঝুড়ি না থাকায় তার কী লাভ হোতো ?

নাস্তিয়া 'প্যালেস্টাইনে' পৌঁছলো তার বড় ঝুড়িটা নিয়ে। সেটার তলায়, টক বেরিগুলোর নীচে তার খাবারগুলোর কথা সে গেলো ভুলে।

যখন 'প্যালেস্টাইনের' সুন্দর দৃশ্য সে দেখতে পেলো কেন সেই ছোটো মেয়েটি, দেখতে যাকে প্রায় লম্বা লম্বা ঠ্যাঙওলা হলদে মুরগিছানার মতো, তার ভাইয়ের কথা ভাবলো না আর তার উদ্দেশ্যে : 'এই যে, এখানে ভাই!' বলে চেঁচিয়ে উঠলো না?

হায় কাক, ভবিষ্যদ্‌বক্তা পাখী! সম্ভবত তোমার নিজেরই বয়স তিন শ' বছর, নিঃসন্দেহে তোমার মা তার তিন শ' বছরের জীবদ্দশায় যা দেখেছিলো তার সব কথা বলেছিলো তোমাকে। এইভাবে পাখীদের মুখেমুখে এই জলায় হাজার হাজার বছর ধরে যা কিছু ঘটেছে সে কথা এসেছে চলে। তুমি, যে অনেক কিছু দেখেছো আর জানো, কেন তুমি অন্তত একবার তোমার কাকের অভ্যেস ছেড়ে তোমার শক্তিশালী ডানায় ভর দিয়ে একটা খবর নিয়ে যাচ্ছো না, বাদায় যে ভাই ডুবে যাচ্ছে তার খবর?!

হে কাক, ওদের বোলো...

'ড্রঙ্-টঙ্!' যে মানুষটি মারাত্মক বিপদে পড়েছে তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় কাকটা চীৎকার করে উঠলো।

'তোমার কথা শুনতে পেয়েছি', বাসা থেকে কাক-গিন্নি বললো সেই একই 'ড্রঙ্-টঙ্' ভাষায়। 'জলা ওকে গিলে ফেলার আগে মনে করে কিছু ছিনিয়ে এনো।'

'ড্রঙ্-টঙ্!' যে ছোটো মেয়েটি স্যাঁতসেঁতে জমির উপর হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছিলো তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় আবার বললো কাক-বাবা। ভাইয়ের কাছ থেকে কয়েক পা দূরে মেয়েটি, যে ভাইটি অমন দারুণ বিপদে পড়েছে। এইবার 'ড্রঙ-টঙের' মানে বাদার উপর দিয়ে যে ছোট্ট মেয়েটি গুটিগুটি চলেছে সে কাকদের পরিবারের পক্ষে উজ্জ্বলতর আশার সামগ্রী হতে পারে।

'প্যালেস্টাইনের' মাঝখানে ক্রানবেরি নেই। সেখানে একটা ঘন আসপেন-কুঞ্জ-ঢাকা ছোট্টো ঢিবি ছিলো। সেটার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো একটা বিরাট শিঙ্ওলা এল্‌ক। এক কোন থেকে এল্‌ক'কে দেখায় একটা ষাঁড়ের মতো, অন্যান্য কোন থেকে দেখায় প্রায় সাধারণ যেন একটা ঘোড়া: সেই লাবণ্যময় দেহ; হালকা, সুঠাম পা; সেই সরু নাসারন্ধ্রওলা মুখ।

কিন্তু মুখটার কী অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, কী শিঙ্, কী চোখ। সেটার দিকে তাকিয়ে তুমি ভাবো: সম্ভবত এটা ষাঁড়ও নয়, ঘোড়াও নয়, আসলে এখানে হয়তো ঘন আসপেন কুঞ্জের ধূসরতার ভিতর দিয়ে কিছু একটা ধূসর আর বিরাটের মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু, না! তার চেয়ে সেটা কিছু বেশী, কারণ ঐ অতিকায় জন্তুটার পুরু পুরু ঠোঁটগুলো কি গাছটাকে স্পর্শ করলো না, আর পেলব গাছের কাণ্ডে কি একটা শাদা সরু দাগ উঠলো না ফুটে? এইভাবে অতিকায় জন্তুটা খেতো। সেখানে প্রায় একটাও আসপেন ছিলো না যেটায় তার দাঁতের দাগ পড়েনি। না, না, ঐ অতিকায় শরীরটা জলার মরীচিকা হতে পারে না! কিন্তু ও ধরনের অতিকায় জীব যে আসপেন বল্কল আর জলার শ্যামরক পাতা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে সেটা কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আর অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ কেন এমন টক ক্রানবেরি দেখে অত লুব্ধ হয়ে পড়ে?

উঁচু থেকে আসপেন গাছের ছাল কামড়াতে কামড়াতে এল্ক শান্তভাবে হামাগুড়ি-দিয়ে-আসা মেয়েটিকে লাগলো দেখতে।

ক্রানবেরি ছাড়া আর সব কথা ভুলে নাস্তিয়া একটা বিরাট কালো গাছের গুঁড়ির কাছে এলো হামাগুড়ি দিয়ে।

যে ছোট্ট মেয়েটিকে একদা আমরা জানতাম 'লম্বা ঠ্যাঙওলা হলদে মুরগিছানা' বলে, তার শরীরটা এখন ভিজে আর নোংরা হয়ে গেছে। তার পিছনকার ঝুড়িটাকে কোনোমতে সে আনছে টেনে।

এল্‌ক তাকে এমন কি মানুষ বলে মনে করলো না। কারণ তার হাবভাবটা পশুদের চেয়ে আলাদা নয়। পশুদের সে নির্বিকারভাবে দেখতে অভ্যস্ত, আমরা যেমন করে নিষ্প্রাণ পাথরকে দেখি।

সেখানে সূর্য-রশ্মি শুষে খুব গরম হয়ে উঠছিলো একটা বিরাট কালো গাছের গুঁড়ি। সন্ধে হয়ে আসছিলো। বাতাস আর চতুর্দিকের সবকিছু জিনিস হয়ে আসছিলো ঠাণ্ডা। কিন্তু সেই বিরাট কালো গাছের গুঁড়িটা তখনো ধরে রেখেছিলো তার উত্তাপকে। ছ'টা ছোটো ছোটো গিরগিটী বাদা থেকে গুটিগুটি বেরিয়ে সেই গুঁড়িটার উপর উঠলো, লেগে রইলো তার উত্তাপের সঙ্গে; চারটে লেবু রঙের প্রজাপতি ডানা বন্ধ করে তাদের শুঁয়োগুলোকে চাপলো তার উপর; বড় বড় কালো কালো মাছিগুলো সমস্ত রাত্রের জন্য সেখানে বসলো। একটা দীর্ঘ ক্রানবেরির ডাঁটা উষ্ণ, কালো গুঁড়িটার প্রত্যেকটি খোঁদলের উপরকার, প্রত্যেকটি ঘাসকে ধরে, গুঁড়িটাকে জড়িয়ে, তার উপরে কয়েকবার পাক খেয়ে নেমে গেছে অন্য দিকে।

বছরের এ সময় এ্যাডাররা সর্বদাই উষ্ণ জায়গা খোঁজে। আধ-মিটার দীর্ঘ একটা বিরাট এ্যাডার গুঁড়িটা বেয়ে উঠে ক্রানবেরি ডাঁটার উপর পড়লো পাকিয়ে শুয়ে।

জলাজমির উপর হামাগুড়ি দিয়ে আসতে আসতে ছোটো মেয়েটি একবারও মুখ তুললো না। এইভাবে সে পোড়া গুঁড়িটার কাছে এসে সেই ক্রানবেরির ডাঁটা ধরে টানলো যেটার উপর এ্যাডারটা বিশ্রাম করছিলো। সাপটা মাথা তুলে ফোঁস করে উঠলো। মেয়েটিও তখন তুললো তার মাথা।

অবশেষে নাস্তিয়া প্রকৃতিস্থ হয়ে লাফিয়ে উঠলো দাঁড়িয়ে। এল্‌কটা তাকে মানুষ বলে চিনতে পেরে আসপেন কুঞ্জ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে, তার জোরালো, লম্বা লম্বা, বাঁশের মতো পাগুলোকে সামনে ছুঁড়ে, বিপদসঙ্কুল জলার উপর দিয়ে লঘু পায়ে গেলো ছুটে, খরগোশরা যে রকম শুকনো পথ দিয়ে ছুটে যায়।

এল্‌ককে দেখে চমকে উঠে সাপটার দিকে অবাক হয়ে তাকালো নাস্তিয়া: সূর্য-রশ্মির উষ্ণতায় আগের মতো পাকিয়ে শুয়ে রইলো এ্যাডারটা।

নাস্তিয়া অনুভব করলো যেন সে নিজে পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে গুঁড়িটার উপর এবং যে নাস্তিয়া এখন তাকিয়ে রয়েছে হতবুদ্ধি হয়ে সে সবে ছেড়ে ফেলেছে তার সাপের খোলস।

তার থেকে কয়েক পা দূরে একটা বিরাট তামাটে রঙের কুকুর দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দিকে তাকিয়ে। তার পিঠের উপর সরু কালো ডোরাকাটা দাগ। কুকুরটা ত্রাভকা।

নাস্তিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনলো, কারণ আন্তিপিচ যখন গ্রামে যেতো ত্রাভকা তখন মাঝেমাঝে আসতো তার সঙ্গে। কিন্তু কুকুরটার নাম সে ঠিক মতো মনে করতে পারলো না, তাই তাকে সে ডাকলো :

'মুরাভ্কা, মুরাভ্কা, আয়, তোকে আমি এক টুকরো রুটি দোবো।'

নাস্তিয়া ঝুড়িটার দিকে হাত বাড়ালো। ঝুড়িটা কানায় কানায় ভরা, আর রুটিটা রয়েছে ক্রানবেরিগুলোর তলায়। এর মানে খুব সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত একটার পর একটা করে বেরি তুলে তুলে সেটাকে ভরতে তার বহু ঘণ্টা কেটে গেছে। কোথায় তা হলে তার বেচারা ক্ষুধার্ত ভাইটি, কী করে একেবারে সে গিয়েছিলো ভুলে তার কথা, নিজের কথাও, বলতে গেলে সবকিছুরই কথা?

যে গুঁড়িটার উপর সাপটা পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে সেটার দিকে আর একবার তাকিয়ে অকস্মাৎ সে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো :

'মিতিয়া। ভাই।'

আর ক্রানবেরির ঝুড়ির পাশে আছড়ে পড়ে ভয়ানক ফুঁপিয়ে উঠলো কেঁদে।

এই তীক্ষ্ণ চীৎকারটাই পেঁৗছেছিলো 'অন্ধ জলাটায়'। এটাকেই মিতিয়া শুনে উত্তর দিয়েছিলো, কিন্তু বাতাসের ঝাপটা তার উত্তরটা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো অন্য দিকে।

১০

যে প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটা বেচারী নাস্তিয়ার ডাককে তার কানে ভাসিয়ে এনেছিলো সেটাই সন্ধের প্রশান্তি নেমে আসার আগে শেষ ঝাপটা নয়। ঠিক তখনই ডুবন্ত সূর্য যাচ্ছিলো একটা ঘন মেঘের পিছন দিয়ে। তার তলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিলো সূর্যের সিংহাসনের সোনালী পায়াগুলো।

যে বাতাসের ঝাপটা মিতিয়ার উত্তরকে নিয়ে গিয়েছিলো ভাসিয়ে সেটাও শেষ ঝাপটা নয়।

শেষ বাতাসের ঝাপটা এলো যখন সূর্যের সিংহাসনের সোনালী পায়াগুলো মনে হোলো যেন পৃথিবীর মধ্যে ডুবে গেছে আর বিরাট, স্বচ্ছ লাল বৃত্তটি সবে স্পর্শ করছে দিগন্তকে। ছোটো রেডউইঙ পাখীটি ধরলো তার মিষ্টি গান। চ্যাপ্টা পাথরের পাশে এখন শান্ত গাছগুলোর মধ্যে কোস্যাচ ভীরু স্বরে শুরু করলো তার মিলন-সঙ্গীত। আর সারসগুলো

ডেকে উঠলো তিনবার — তাদের প্রাতঃকালীন 'বিজয়' ডাক নয় — এমন ডাক, যেগুলোর মানে নিশ্চয়ই এই ধরনের:

'ঘুমুতে যাও, কিন্তু মনে রেখো: শীগ্গিরই তোমাদের জাগাবো সবাইকে, সবাইকে, সবাইকে!'

বাতাসের ঝাপটা দিয়ে দিন শেষ হোলো না, শেষ হোলো এক মৃদু বায়ুপ্রবাহে। তারপর নামলো এক বিরাট স্তব্ধতা আর মৃদুতম শব্দগুলো, এমন কি 'শুকনো স্রোতের' অরণ্যের মধ্যে হেজেল-গ্রোজ পাখীর মৃদু শিসগুলোও যেতে লাগলো শোনা।

সে সময় কোনো মানুষ বিপদে পড়েছে বুঝতে পেরে ত্রাভকা এলো নাস্তিয়ার কাছে। সে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। ত্রাভ্‌কা চাটতে লাগলো তার গাল। চোখের জলে সেটা নোনতা হয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্য নাস্তিয়া তার মাথাটা তুললো, কুকুরের দিকে তাকালো, তারপর একটি কথাও না বলে বেরির উপর রাখলো তার মাথাটা। ক্রানবেরির স্তরের ভিতর দিয়ে ত্রাভ্‌কা স্পষ্টভাবে রুটির গন্ধ পাচ্ছিলো, কিন্তু তার দারুণ খিদে পাওয়া সত্ত্বেও ঝুড়ির মধ্যে থাবাটা ঢোকাবার কথাটা সে কল্পনা করতে পারতো না। তার বদলে, একজন মানুষ বিপদে পড়েছে বুঝতে পেরে সে মাথা তুলে উঠলো ডেকে।

আমার যেন মনে পড়ে অনেক অনেক দিন আগে পুরনো আমলের মতো এক ত্রয়কা করে অরণ্য পথে আমরা যাচ্ছিলাম, ঘণ্টাগুলো উঠছিলো ঝনঝন করে। ঠিক এখনকার মতোই সন্ধে হয়ে আসছিলো। খাপছাড়াভাবে চালক রাশ টেনে ঘোড়াগুলোকে থামালো, ঘণ্টাগুলো যখন থেমে গেলো চালক কান খাড়া করে বললো:

'কোথাও কিছু বিপদ হয়েছে।'

আমরাও যেন কী একটা শব্দ পেলাম শুনতে।

'কী ওটা?'

'কিছু একটা বিপদ ঘটেছে: বনের মধ্যে একটা কুকুর ডাকছে।'

সেবার কী ঘটেছিলো আমরা বার করতে পারিনি। সম্ভবত সেবারও কোনো লোক ডুবছিলো জলাটায়, আর মানুষের বিশ্বাসী বন্ধু, কুকুর, ঘৌ ঘৌ করে করছিলো বিদায় প্রার্থনা।

সন্ধ্যার স্তব্ধতার মধ্যে ত্রাভ্কার আর্তনাদ 'বুড়ো জমিদার' শুনতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো যে সেটা আসছে 'প্যালেস্টাইন' থেকে। সোজা সেদিকে সে দৌড়লো।

কিন্তু ত্রাভ্কা শীঘ্রই চীৎকার থামালো। 'বুড়ো জমিদার' দাঁড়িয়ে পড়লো স্তব্ধ হয়ে। সে অপেক্ষা করতে লাগলো চীৎকারটা আবার শুরু হবার জন্য।

আর ঠিক তখনই ত্রাভকা নিজে শুনতে পেলো এক পরিচিত, তীক্ষ্ণ খ্যাঁক-খ্যাঁক শব্দ। সেটা আসছিলো চ্যাপ্টা পাথরের দিক থেকে। ত্রাভ্‌কা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো সেটা খ্যাঁকশেয়ালের ডাক, সে তাড়া করেছে একটা খরগোশকে। সে অবশ্য একথাও বুঝলো যে খ্যাঁকশেয়ালটা সেই একই খরগোশটারই গন্ধ পেয়েছে যেটাকে সে নিজে আবিষ্কার করেছিলো সেই চ্যাপ্টা পাথরটার কাছে। এ কথাও ত্রাভ্‌কা বুঝতে পারলো যে চালাকি না করে খ্যাঁকশেয়ালটা কখনো খরগোশকে ধরতে পারবে না, আর সে খ্যাঁক-খ্যাঁক করছে যাতে দৌড়ে খরগোশটার পা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ফলে দৌড়তে দৌড়তে সে যখন ক্লান্ত হয়ে কোনো বাসস্থানে শুয়ে পড়বে তখন ধরবে তাকে। আন্তিপিচের মৃত্যুর পর থেকে নিজের খাদ্য জোগাড় করার জন্য ত্রাভকা এই উপায় অবলম্বন করে এসেছে। খ্যাঁকশেয়ালকে খ্যাঁক-খ্যাঁক করতে শুনলে সে শিকার করে নেকড়েদের পদ্ধতিতে: তাড়া করার সময় নেকড়েরা যেমন দাঁড়ায় খরগোশের পিছন পিছন ঘেউ ঘেউ করে যাওয়া কুকুরের জন্য, সেই রকম সে থাকে ওৎ পেতে, অপেক্ষা করে থাকে খ্যাঁকশেয়ালের তাড়া-খাওয়া খরগোশকে ধরার জন্য।

খ্যাঁকশেয়ালের খ্যাঁক-খ্যাঁক শুনে ও রকম অবস্থায় আমরা, শিকারীরা যে ভাবে বুঝি, ত্রাভ্‌কাও সে রকমই বুঝতে

পারলো কোন পথ খরগোশটা নিঃসন্দেহে ধরবে: চ্যাপ্টা পাথর থেকে 'অন্ধ জলায়', সেখান থেকে 'শুকনো স্রোতে', আর তারপর খুব বড় এক চক্কর ঘুরে 'প্যালেস্টাইনের' দিকে, আর সেখান থেকে অবধারিতভাবে আবার চ্যাপ্টা পাথরে। তাই ত্রাভকা সোজা গেলো চ্যাপ্টা পাথরে আর সেখানে লুকিয়ে রইলো একটা ঘন জুনিপার ঝোপের পিছনে।

বেশীক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হোলো না। জলার উপরকার পথে ছোটো ছোটো ডোবার উপর খরগোশের থাবার অস্পষ্ট চুকচুক শব্দ তার তীক্ষ্ণ কান দুটো শুনতে পেলো, সে শব্দটা এতো অস্পষ্ট যে মানুষে শুনতে পায় না। সকালে নাস্তিয়ার পায়ের ছাপের উপর এই ডোবাগুলো গড়ে উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে চ্যাপ্টা পাথরের কাছে খরগোশটা এসে পড়বে।

ঝোপের পিছনে ত্রাভকা বসলো গুঁড়ি মেরে, সজোরে সামনে লাফাবার প্রস্তুতিতে টান-টান হয়ে রইলো তার পিছনকার পা দুটো, আর এক জোড়া কান দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে দিলো লাফ।

খরগোশটা ছিল বুড়ো আর মাগি। সে হাঁটছিল ধীরে ধীরে। তখনই সে স্থির করলো একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে এমন কি পিছনের পা দুটোয় ভর দিয়ে একটু উঠতে।

সে থাপ্পন গেড়ে বসে পড়লো তার আর খ্যাঁক-খ্যাঁক করে তেড়ে-আসা খ্যাঁকশেয়ালের মধ্যেকার দূরত্বটা শব্দ থেকে অনুমান করার জন্য।

খরগোশটার আচমকা দাঁড়িয়ে পড়া আর ত্রাভ্‌কার লাফ— দুটোই ঘটলো যুগপৎ।

তাই খরগোশটার মাথার উপর দিয়ে চলে গেলো ত্রাভকা।

কুকুরটা যখন নিজেকে সামলে নিলো ইতিমধ্যেই খরগোশটা তখন প্রাণপণে ছুটতে শুরু করেছে মিতিয়ার পথ ধরে 'অন্ধ জলাটার' দিকে।

নেকড়ের পদ্ধতিটা তাই কার্যকরী হোলো না: অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত খরগোশটা এখন আর ফিরবে না। ত্রাভ্‌কা কুকুরের পদ্ধতি ধরে ছুটলো খরগোশটার পিছনে, তীক্ষ্ণ চীৎকার করে সে সন্ধ্যার স্তব্ধতাকে ভরে তুললো কুকুরের ঘৌ ঘৌ ডাকে।

কুকুরের গলা শুনে অবশ্যই খ্যাঁকশেয়ালটা খরগোশকে তাড়া করা ছেড়ে মেঠো ইঁদুর ধরার দৈনন্দিন কাজে লেগে গেলো ...

আর বহু-প্রত্যাশিত কুকুরের ডাক শুনে 'বুড়ো জমিদার' ছুটলো 'অন্ধ জলার' দিকে।

হাঁড়িচাঁচারা যখন খরগোশকে আসতে শুনলো তারা দু'দলে ভাগ হয়ে গেলো : এক দল ছোটো মানুষটির কাছ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো :

'ড্রি-টি-টি!'

অন্যরা খরগোশকে সম্বোধন করে উঠলো : 'ড্রা-টা-টা!'

হাঁড়িচাঁচাদের উত্তেজিত আবোল-তাবোল শব্দের মানে বোঝা কঠিন। সেটা সাহায্যের জন্য ডাক কখনই হতে পারে না, কারণ সাহায্য যদি আসে মানুষ কিংবা কুকুরের আকৃতিতে তা হলে তাদের নিজেদেরই হবে লোকসান। সম্ভবত তারা তাদের চীৎকার দিয়ে চেষ্টা করছিলো সমস্ত হাঁড়িচাঁচা জাতকে রক্তাক্ত ভোজের জন্য জড় করতে। কে বলতে পারে...

'ড্রি-টি-টি!' ছোটো মানুষটির কাছে ক্রমশ লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে তারা চেঁচিয়ে উঠলো।

তারা তার খুব কাছে আসতে সাহস করলো না, কারণ ছোটো মানুষটির হাত দুটো তখনো খোলা ছিলো। অকস্মাৎ হাঁড়িচাঁচাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেলো। একই পাখী কখনো চীৎকার করতে লাগলো 'ড্রা-টা-টা', কখনো 'ড্রি-টি-টি'।

এটা হোলো খরগোশটা যে 'অন্ধ জলার' দিকে আসছে তার সঙ্কেত।

এই খরগোশটার ত্রাভকাকে এড়াবার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলো, অতএব সে জানতো যে চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করার প্রয়োজন। তাই, জলার একেবারে পাশে, ছোটো মানুষটির কাছ থেকে কয়েক পা দূরে সে থেমে পড়লো। এইভাবে হাঁড়িচাঁচাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলো সে। তারা সবাই ফার গাছটার মগডালে চড়ে খরগোশটার উদ্দেশ্যে লাগলো চেঁচাতে:

'ড্রা-টা-টা!'

কী জানি কী কারণে খরগোশরা এই চীৎকারে কোনো রকম গুরুত্ব আরোপ করে না। হাঁড়িচাঁচাদের একেবারে গ্রাহ্য না করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যায়। সেজন্যই মাঝে মাঝে মনে হয় যে এই সব হাঁড়িচাঁচা বুলির কোনো মানে হয় না, আর তারা মানুষের মতোই একেবারে একঘেয়েমির দরুণ সময় কাটায় বাজে বকবক করে।

খানিক দাঁড়িয়ে খরগোশটা একপাশে প্রথম লাফ মারলো, তারপর, আর এক মুহূর্ত থেমে লাফ মারলো উলটো দিকে, তারপর কতকগুলো ধারাবাহিক ছোটো ছোটো লাফের পর আবার বড় এক লাফে দিগ্‌পরিবর্তন করে ঘুরে বসলো

নিজের পদচিহ্নের দিকে। সে প্রথম দেখতে চাইলো ত্রাভ্কাকে, জানতে চাইলো ত্রাভ্কা তার চালাকি চিনে তার দিকে ছুটে আসছে কিনা।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, খরগোশরা চালাক, ভারি চালাক। কিন্তু এই সব চালাকি বিপজ্জনক হতে পারে: বুদ্ধিমান শিকারী কুকুররা জানে যে নিজেদের পদচিহ্নের দিকে তাকাবার অভ্যেস খরগোশদের আছে, আর সে কোন দিকে লাফিয়েছে সেটা অনুমান করে পদচিহ্ন শুঁকে নয়, বাতাসে তার নাকটা তুলে।

এই ছোট্ট জন্তুদের বুকগুলো কী দারুণই না স্পন্দিত হয় যখন সে আর ঘেউ ঘেউ শুনতে পায় না আর বুঝতে পারে যে কুকুরটা মারাত্মক নিঃশব্দ অনুসন্ধান শুরু করেছে...

এইবার খরগোশটার কপাল ভালো ছিলো। সে বুঝতে পারলো যে কুকুরটা জলায় রোঁদে বেরিয়ে নিশ্চয়ই কিছু একটা দেখেছে। অকস্মাৎ একটা মানুষের স্বর স্পষ্ট শোনা গেলো আর তারপর শুরু হোলো একটা তুমুল হৈ চৈ...

অনুমান করা যেতে পারে যে এই শব্দ শুনে খরগোশটা মনে মনে বলেছিলো 'আমি বরং গা ঢাকা দি!'—এই ধরনের কিছু, আর ধীরে ধীরে ফিরে গিয়েছিলো চ্যাপ্টা পাথরটার কাছে। খরগোশটার পিছন পিছন জলার উপর

দিয়ে ছুটতে ছুটতে ত্রাভকা তার সামনে প্রায় দশ পা দূরে নিজেকে আবিষ্কার করলো সেই ছোটো মানুষটির চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে থাকতে, আর তারপর, খরগোশটার কথা একেবারে ভুলে সে দাঁড়িয়ে গেলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

জলার মধ্যেকার ছোটো মানুষটির দিকে তাকাবার সময় কুকুরটি যে কী ভাবছিলো সে-কথা অনুমান করা কঠিন নয়। আমাদের চোখেই শুধু আমরা পরস্পরকে আলাদা আলাদা করে দেখি। ত্রাভকার কাছে মনুষ্যজাতি বিভক্ত দুটি শ্রেণীতে: বিভিন্ন মুখওয়ালা আন্তিপিচ আর অন্য মানুষরা, আন্তিপিচের যারা শত্রু। এ কারণেই কোনো ভালো, বুদ্ধিমান কুকুর প্রথম দেখলে কোনো মানুষের কাছে যায় না। সে থেমে গিয়ে ভাবে সেই মানুষটি তার প্রভু, না কি তার প্রভুর শত্রু।

ত্রাভকা তাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো এই ছোটো মানুষটির মুখের দিকে চেয়ে। সেই মুখটি আলোকিত হয়ে উঠেছিলো ডুবন্ত সূর্যের শেষ রশ্মিতে।

প্রথম দিকে এই ছোটো মানুষটির চোখ দুটি অনুজ্জ্বল আর নিস্তেজ ছিলো, কিন্তু অকস্মাৎ মনে হোলো কী যেন কেঁপে উঠলো তার মধ্যে; সঙ্গে সঙ্গে ত্রাভকা সেই কম্পনকে পেলো দেখতে।

'এর আন্তিপিচ হবার সম্ভাবনাই বেশী', ত্রাভকা ভাবলো। সে তার লেজটা নাড়ালো ভারি মৃদুভাবে।

আমরা অবশ্য বলতে পারি না কী দেখে ত্রাভকা স্থির করে কে আন্তিপিচ আর কে নয়। কিন্তু আমরা কয়েকটা অনুমান করতে পারি। তোমার কি মনে পড়ে, এ রকম তোমার কি কখনো হয়েছে যে, অরণ্যের কোনো স্তব্ধ খাঁড়ির দিকে ঝুঁকে চেয়ে অকস্মাৎ আয়নায় মুকুরিত ছায়ার মতো কোনো মানুষকে পেয়েছো দেখতে—যার চেহারাটা মহৎ আর শ্রীমণ্ডিত, ত্রাভকার কাছে আন্তিপিচ যে রকমটি ছিলো—সেই রকম? সেই লোকটি তোমার পিছন থেকে জলের উপর ঝুঁকে পড়েছে, জলের মধ্যে সেও রয়েছে তাকিয়ে, যেন তাকিয়ে রয়েছে আয়নার মধ্যে। সেই আয়নার মধ্যে কী চমৎকার তাকে দেখায়—চারিধারে তার বিশ্বপ্রকৃতি, মেঘ, গাছ, যে সূর্যটি ডুবছে সেটি, নতুন যে চাঁদটি করছে আত্ম-প্রকাশ সেই চাঁদ আর গুচ্ছ গুচ্ছ তারা...

এইভাবেই সম্ভবত মানুষ আন্তিপিচ ত্রাভকার কাছে মুকুরিত হয় সমস্ত মানুষের মুখের মধ্যে। অভিজ্ঞতা তাকে যদি না শেখাতো যে ঠিক একই রকম মুখগুলোর মধ্যে আন্তিপিচের শত্রু আছে তা হলে প্রত্যেক মানুষের কোলে সে ভালোবাসতো ছুটে যেতে।

তাই সে দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিন্তু তার থাবাগুলোও লাগলো ক্রমশ ডুবতে। যদি একই জায়গায় বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে তা হলে এমন কি কুকুরের থাবাগুলোকেও বাদা টেনে নেয়, সেগুলোকে সে টেনে বার করতে পারে না। আর তার অপেক্ষা করা কিছুতেই উচিত নয়।

আর অকস্মাৎ...

বজ্র নয় বিদ্যুৎ নয়, বিজয়ের হর্ষধ্বনি সহকারে নয় সূর্যোদয়, সারসদের আর একটি সুন্দর দিনের প্রতিশ্রুতি-সম্বলিত নয় সূর্যাস্ত — এ সব কিছুই নয়। জলায় যেটা ঘটলো তার চেয়ে প্রকৃতির কোনো অত্যাশ্চর্য ঘটনাই ত্রাভকার কাছে বেশী বিস্ময়কর হোতো না: সে মানুষের ভাষায় শুনতে পেলো একটা কথা, আর কী আশ্চর্যই না কথাটা।

আন্তিপিচ ছিলো সত্যিকারের বিরাট শিকারী। সে তার শিকারী কুকুরের নাম দিয়েছিলো শিকারীর উপযুক্ত। সে নামটার ব্যুৎপত্তি রুশ ক্রিয়া 'ত্রাভিত'-এর (শিকার করা) মূলশব্দ থেকে। প্রথমে আমাদের ত্রাভ্কাকে ডাকা হোতো 'জাত্রাভকা' নামে। কিন্তু ক্রমশ তার শিকারী বৈশিষ্ট্যটা পেলো লোপ, নামটাকে ছোটো করে রূপান্তরিত করা হোলো মনোরম ত্রাভকা। শেষবার আন্তিপিচ তার কুকুরকে নিয়ে যখন আমাদের গ্রামে এসেছিলো তখনো তার নাম ছিলো

জাত্রাভকা। মিতিয়ার চোখের কম্পন বোঝালো যে অকস্মাৎ কুকুরের নামটা তার মনে পড়েছে। তখন ছোটো মানুষটির নীল ঠোঁটে রক্ত এলো ছুটে, তাই সেগুলো লাল হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। ঠোঁটের এই কম্পনটা ত্রাভকা পেলো দেখতে, তখনই দ্বিতীয়বারের বার সে লেজ নাড়িয়েছিলো। আর তারপর শোনা গেলো সেই কথাটা ত্রাভ্কার যেটাকে মনে হোলো অলৌকিক ঘটনা বলে। আগেকার দিনের সেই পুরনো আন্তিপিচের মতো এই ছোটো আর তরুণ নতুন আন্তিপিচ বললো :

'জাত্রাভ্কা।'

তাকে এক আন্তিপিচ বলে চিনতে পেরে ত্রাভ্কা সঙ্গে সঙ্গে পড়লো শুয়ে।

'চলে এসো।' আন্তিপিচটি বললো। 'আমার কাছে চলে এসো, লক্ষ্মী কুকুর।'

উক্ত কথাগুলোর প্রত্যুত্তরে ত্রাভ্কা গুটিগুটি গেলো তার কাছে।

কিন্তু ত্রাভকা যাই ভেবে থাকুক না কেন এই ছোটো মানুষটি তাকে নির্মল বন্ধুত্বের অর্থে ডাকছিলো না। তার কথাগুলির পিছনে শুধ আনন্দ আর বন্ধুত্বের ভাব ছিলো না, ছিলো নিজের উদ্ধারের জন্য এক চতুর পরিকল্পনা।

সে শুধু যদি ত্রাভ্‌কাকে তার পরিকল্পনার কথাটা এমন ভাবে বিশদ করে বুঝিয়ে বলতে পারতো যেটা ত্রাভ্‌কা বুঝতে পারে তা হলে কী আনন্দের সঙ্গেই না ত্রাভকা ছুটে যেতো তাকে বাঁচাতে। কিন্তু তাকে বোঝাবার তার কোনো উপায় ছিলো না, তাই তাকে মিষ্টি কথায় ভোলাতে সে বাধ্য হয়েছিলো। এমন কি তাকে ত্রাভ্‌কার ভয় করারও দরকার। কারণ সে যদি ভয় না করে, যদি তার মনে বিরাট আর শক্তিশালী আন্তিপিচের ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাবটা সে না পারে উদ্রেক করতে, যদি সে কুকুরের প্রকৃতিগত রীতিতে লাফিয়ে ওঠে তার কাঁধে, তা হলে জলাটা অনিবার্যভাবে মানুষ আর মানুষের বন্ধু কুকুর—উভয়কেই ফেলবে গিলে। ত্রাভকার মনে সেই মহৎ মানুষটির যে আদর্শ ছিলো ছোটো মানুষটি তার সমান হতে পারলো না। তাই তাকে আশ্রয় নিতে হোলো চাতুরীর।

'জাত্রাভ্‌কা, লক্ষ্মী জাত্রাভ্‌কা', সস্নেহে সে বলতে লাগলো আর সর্বক্ষণ লাগলো ভাবতে: 'আরো কাছে গুঁড়ি মেরে আয়, আয়, আয়!'

সরল কুকুরটির বিশুদ্ধ মন বুঝতে পারলো আন্তিপিচের এই কথাগুলি খাঁটি নয়। বারবার থামতে থামতে সে আসতে লাগলো এগিয়ে।

'আয়, লক্ষ্মীটি, আয়, আর একটুখানি কাছে।' মিতিয়া বললো আর লাগলো ভাবতে: 'আমার কাছে শুধু গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আয়, আর কিছু নয়।'

অল্প অল্প করে ত্রাভকা গেলো তার কাছে গুঁড়ি মেরে। এখনও তার বন্দুকের উপর ভর দিয়ে, সামান্য ঝুঁকে, হাত বাড়িয়ে মিতিয়া পারে কুকুরটার মাথায় হাত বোলাতে। কিন্তু এই ধূর্ত ছোটো মানুষটি জানতো যে যে মুহূর্তে সে কুকুরটিকে স্পর্শ করবে সে আনন্দ-ধ্বনি করে উঠবে তার উপর লাফিয়ে আর দেবে তাকে ডুবিয়ে।

তাই এই ছোটো মানুষটি তার হৃদয়ের বিপুল আবেগকে রুদ্ধ করল। যে সৈনিক যুদ্ধের নিষ্পত্তির জন্য চরম আঘাত হানতে প্রস্তুত তার মতো সে প্রতিটি নড়াচড়ার হিসেব করতে লাগলো রুদ্ধ নিশ্বেসে।

আর একটি মুহূর্ত পরেই ত্রাভ্কা লাফাবে মানুষটির কাঁধের উপর। কিন্তু ছোটো মানুষটির হিসেবে ভুল হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে সে তার ডান হাতটা বাড়িয়ে এই বিরাট শক্তিশালী কুকুরের বাঁ দিকের পিছনের পাটা ধরলো।

এই রকম বিশ্বাসঘাতক ব্যবহারটা আন্তিপিচের শত্রুর মতোই।

নিজেকে মুক্ত করতে ত্রাভ্কা মরিয়ার মতো চেষ্টা করলো। ছোটো মানুষটির মুঠো থেকে নিজেকে সে পারতো ছাড়িয়ে

নিতে যদি না ইতিমধ্যে সে জলা থেকে অর্দ্ধেকটা বেরিয়ে তার পিছনকার অন্য পাটা ধরতো। এক মুহূর্ত পরে সে শুয়ে রইলো তার বন্দুকটার উপর উপুড় হয়ে, আর তারপর ত্রাভ্কাকে ছেড়ে কুকুরটির মতো হামাগুড়ি দিয়ে সে লাগলো যেতে। যাবার সময় বন্দুকটাকে সামনে ঠেলে ঠেলে, তার উপর ভর দিয়ে চললো, মানুষ যে পথ ব্যবহার করে সে পথে পৌঁছনো না পর্যন্ত। এই পথের দু'ধারে, মানুষের পায়ের ছাপের দু'পাশে, লম্বা শাদা শাদা ঘাসগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সেখানে পৌঁছে সে উঠে দাঁড়ালো, মুখ থেকে মুছে ফেললো শেষ অশ্রু চিহ্ন, তার শতছিন্ন পরিচ্ছদ থেকে মছলো কাদা, তারপর বাস্তবিক পূর্ণবয়স্ক লোকের মতো সে বললো আদেশ দেবার সুরে:

'এখন আমার কাছে আসতে পারিস, আমার জাত্রাভ্কা।'

ঐ কথাগুলো, আর যে স্বরে সেগুলো উচ্চারিত হোলো সেটা ত্রাভকার দ্বিধাকে দূর করলো: তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পুরনো আন্তিপিচ পূর্ণ দীপ্তিতে। তার প্রভুকে চিনতে পেরে আনন্দ-ধ্বনি করে সে ছুটে এলো তার কাছে আর মানুষটি তার বন্ধুর নাক, চোখ আর কানের উপর করতে লাগলো চুম্বন-বৃষ্টি।

আমাদের বুড়ো বন-রক্ষী আন্তিপিচ কথা দিয়েছিলো যে আমরা যদি তার মৃত্যুর আগে তার সঙ্গে দেখা করতে না পারি তা হলে সে তার মতে সত্য কী সেটা তার কুকুরের কানে কানে যাবে বলে — সেই হেঁয়ালি-ভরা কথাগুলো সম্বন্ধে আমরা কী ভাবি সে কথাটা বলার এখন সময় হয়েছে। আমরা মনে করি না সেটা তার একটা রসিকতা। এটা খুবই সম্ভব যে আন্তিপিচ, ত্রাভ্‌কা তাকে যে-ভাবে বুঝেছিলো, অর্থাৎ প্রাচীন অতীতের সমগ্র একটি মানুষ, সে তার বন্ধু কুকুরটির কানে ফিসফিস করে বলেছিলো একটি বিরাট মানবিক সত্য। আমাদের মনে হয় ভালোবাসার জন্য মানুষের শাশ্বত, কঠিন সংগ্রামের এটাই হোলো চরম সত্য।

১২

ব্লুদভ জলার সেই স্মরণীয় দিনের ঘটনাগুলির কথা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলার নেই। যদিও দিনটা ছিলো বেশ দীর্ঘ, তবু ত্রাভ্‌কার সহায়তায় জলা থেকে মিতিয়া যখন উদ্ধার পেলো তখনো দিনটি সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। একটি আন্তিপিচের সঙ্গে মিলিত হবার আনন্দের প্রথম গভীর আবেগের পর করিত-কর্মা ত্রাভ্‌কার মনে পড়লো তার ব্যাহত খরগোশ-শিকারের কথা। আর এ কথায় আশ্চর্য

হবার কারণ নেই যে শিকারী কুকুর হওয়ায় তার জীবিকানির্বাহের কাজ নিজের জন্য খরগোশের পিছনে দৌড়নো, কিন্তু তার জীবনের আনন্দ তার নিজের আন্তিপিচের জন্য একটা খরগোশ ধরা। মিতিয়াকে তার আন্তিপিচ বলে চিনতে পেরে সে এখন আবার তার ব্যাহত অনুসন্ধানের কাজে বেরুলো। শীঘ্রই সে দেখতে পেলো খরগোশটির পদচিহ্ন আর তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকতে ডাকতে স্পষ্ট পদচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগলো। ক্ষুধায় মিতিয়া অর্দ্ধমৃত হয়ে পড়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারলো তার পরিত্রাণের একমাত্র পথ এই খরগোশটা। যদি সেটাকে সে মারতে পারে তা হলে বন্দুক ছুঁড়ে আগুন ধরিয়ে—যে ভাবে আগুন ধরাতে প্রায়ই তার বাবাকে সে দেখেছে—খরগোশটাকে সে ঝলসাতে পারবে গরম ছাইতে। বন্দুকটাকে পরীক্ষা করে, ভিজে কার্তুজগুলো বদলে সে সরে গিয়ে দাঁড়ালো জুনিপার ঝোপের পিছনে।

বন্দুকের মাছির দিকে তাকাবার মতো তখনো যথেষ্ট আলো রয়েছে, এমন সময় ত্রাভকা চ্যাপ্টা পাথর থেকে নাস্তিয়ার পথের দিকে খরগোশটাকে তাড়া করে চললো 'প্যালেস্টাইনের' ফাঁকা জায়গাটায়। তারপর সেটাকে ফেরালো সেই জুনিপার ঝোপের দিকে, যার পিছনে শিকারী ছিলো

লুকিয়ে। কিন্তু এদিকে হোলো কি, 'বুড়ো জমিদার' যখন শুনতে পেলো যে কুকুরটা আবার তাড়া শুরু করেছে সেও সেই ঝোপটাই নিজের লুকোবার জায়গা হিসেবে বেছে নিলো যেটার পিছনে লুকিয়ে ছিলো শিকারী, আর মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো দুই শিকারীর—মানুষ, আর তার দুঃসহ শত্রুর। মিতিয়া যখন সেই ধূসর মুখটাকে তার পাঁচ পা'রও কাছে দেখলো, খরগোশটার কথা সম্পূর্ণ ভুলে সোজাসুজি সে গুলি চালালো নেকড়েটার উপর।

প্রায় কোনো যন্ত্রণা না পেয়েই শেষ হোলো 'বুড়ো জমিদারের' জীবন।

যদিও অবশ্যই বন্দুকের শব্দে তাড়া দেওয়াটা একেবারে গেলো ভেস্তে তবু ত্রাভ্কা নিরস্ত হোলো না। কিন্তু সবচেয়ে ভালো ব্যাপারটা খরগোশ কিংবা নেকড়ে নয়, সেটা এই—কাছেই বন্দুকের শব্দ শুনে নাস্তিয়া উঠলো চেঁচিয়ে, আর মিতিয়া তার স্বর চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে দিলো উত্তর। মুহূর্তের মধ্যে নাস্তিয়া এসে পড়লো তার পাশে। তার অল্প পরেই ত্রাভকা ফিরলো তার নতুন, তরুণ আন্তিপিচের জন্য খরগোশটা নিয়ে, আর তিন বন্ধুতে আগুনতাতে বসে নিজেদের গরম করে নিয়ে তৈরী হতে লাগলো রাত্রির আহার আর বিশ্রামের জন্য।

* * *

আমাদের একটা বাড়ি পেরিয়েই থাকতো নাস্তিয়া আর মিতিয়া। পরের দিন সকালে তাদের ক্ষুধার্ত পশুরা যখন ডাকতে লাগলো আমরাই প্রথম দেখতে গেলাম সবকিছু ঠিক আছে কি না। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম যে রাত্রে তারা বাড়িতে ছিলো না আর ভাবলাম নিশ্চয়ই তারা জলায় পথ হারিয়েছে। ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রতিবেশীরা এসে জড় হোলো। আমরা সবাই আলোচনা করতে লাগলাম যদি তখনো তারা বেঁচে থাকে তা হলে ছেলেমেয়েদের উদ্ধার করার সবচেয়ে ভালো উপায়টার কথা। আমরা সবাই জলাটার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় দেখতে পেলাম আমাদের ক্রানবেরি অনুসন্ধানকারীদের — একের পিছনে একজন আসছে এগিয়ে, তাদের কাঁধে বাঁশ দিয়ে ঝোলানো একটা ভারি ঝুড়ি। আন্তিপিচের কুকুর ত্রাভ্কা আসছে তাদের পাশে।

তারা খুব খুঁটিয়ে ব্লুদভ জলায় তাদের দুঃসাহসিকতার গল্পটা আমাদের বললো। তাদের প্রত্যেকটি কথাই আমরা বিশ্বাস করলাম, কারণ নিজেদের চোখে আমরা দেখলাম সেই অবিশ্বাস্য প্রচুর ক্রানবেরিগুলোকে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়েকজন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলো না যে যে ছেলের এগার বছরও বয়স হয়নি সে গুলি করে মেরেছে

সেই ধূর্ত, বুড়ো নেকড়েটাকে। যারা বিশ্বাস করেছিলো তাদের মধ্যে কয়েকজন একটা বড় স্লেজ আর বড় এক তাল দড়ি নিয়ে যে জায়গাটা বর্ণিত হয়েছিলো তার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো, আর অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এলো 'বুড়ো জমিদারের' মৃত দেহটা নিয়ে। তখন গ্রামের সবাই এবং এমন কি অন্যান্য গ্রামেরও কয়েকজন খানিকক্ষণের জন্য তাদের কাজ ফেলে জড় হোলো। কত কথাই না হতে লাগলো! বলা কঠিন কার দিকে লোকে বেশী করে তাকালো—নেকড়ে, না শিকারীর দিকে, যার টুপিটা হাঁ-করা। নেকড়েটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে লোকে বললো:

'ভাবো একবার, ওকে আমরা ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিলাম "ক্ষুদে চাষী"।'

তারপর থেকে 'ক্ষুদে চাষীটি' ক্রমশই লাগলো বদলে যেতে, আর লড়াইয়ের পরের দু'বছরের মধ্যে পরিণত হোলো এক লম্বা চওড়া যুবকে। লড়াইটা যদি থেমে না যেত তা হলে সে সেই স্বদেশ-প্রেমিক যুদ্ধের একজন বীর হয়ে উঠতো। আর তারপর সেই হলদে মুরগিছানাটিও আমাদের সবাইকে করে দিলো অবাক। তার লোভের জন্য কেউ কখনো তাকে ভর্ৎসনা করার কথা ভাবেনি। বরঞ্চ তার উলটোটাই: তার ভাইকে সুপথে চালিয়ে নিয়ে যাবার বিচক্ষণতার এবং অত ক্রানবেরি পাবার দরুণ সবাই তাকে

প্রশংসা করতো। কিন্তু লেনিনগ্রাদ থেকে স্থানান্তরিত-করা ছেলেমেয়েদের আনাথাশ্রম থেকে লোকেরা যখন এলো গ্রামে আর অসুস্থ ছেলেমেয়েদের জন্য চাইলো সাহায্য, নাস্তিয়া তার সমস্ত ক্রানবেরিগুলো দিয়ে দিলো তাদের। শুধু তখনই ছোটো মেয়েটির বিশ্বাস অর্জন করে আমরা জানতে পারলাম যে নিজের লোভের জন্য নিজেকে সে করেছিলো তিরস্কার।

এখন শুধু আমাদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলার আছে: আমরা কে, কী কারণেই বা এসেছি ব্লুদভ জলায়? আমরা হচ্ছি অনুসন্ধানকারীর দল, জলার সম্পদ আমরা খুঁজছি। স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে জলা থেকে পীট বার করার প্রাথমিক কাজ আমরা শুরু করেছিলাম। আমরা আবিষ্কার করেছিলাম যে সেখানে এতো পীট আছে যা একটা বড় কারখানার এক শ' বছরের ইন্ধন পারে জোগাতে। আমাদের জলাগুলোয় এতো ঐশ্বর্য আছে লুকিয়ে!

এখনো এমন অনেক লোক আছে সূর্যের এই বিরাট ধনাগারগুলো সম্বন্ধে যাদের একমাত্র ধারণা যে সেখানে থাকে শয়তান—এ সব একেবারে বাজে কথা। জলাগুলোয় কোনো শয়তান নেই।

১৯৪৫

সুমেরুর মধু

১

এখন আমি খুব ভালোবাসি অতীতের কোনো বন্ধুর কথা স্মরণ করে তাকে বর্তমানের আলোয় দেখতে। সেই ব্যক্তিটি তখন তার পরীক্ষা ও বিচারের জন্য যেন এক টেলিভিসনের ছোটো উজ্জ্বল চক্রের মধ্যে করে আত্ম-প্রকাশ। টেলিভিসন দিয়ে এই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক শিকারের জন্য বন্দুক কিংবা শিকারী কুকুরের প্রয়োজন হয় না, শিকারকে করা হয় না স্পর্শ। আর আমরা, স্বয়ং জীবনের শিকারীরা, অতীতের উপর বর্তমান যে আলো নিক্ষেপ করে তার থেকে পাই শিক্ষা।

আমি সন্দেহ করতে শুরু করেছি যে অধিকাংশ বৃদ্ধ নরনারীই এ ধরনের শিকার করে থাকেন, বিশেষ করে

বৃদ্ধা মহিলারা যখন মোজা বোনেন। আমার মনে পড়ে আমার দাইমা কী ভাবে ভাবতো যখন আমি বালক অবস্থায় তার দিকে মুখ তুলে প্রশ্ন করতাম:

'দাইমা, কোথায় তুমি গেছো?'

তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসতেন, শেষ করতেন তাঁর বোনার সারি, উলের গোলাটায় কাঁটাগুলো বেঁধাতেন আর তাড়াতাড়ি উঠতেন বলে:

'আসছি, আসছি, মাণিক আমার!'

তাঁর কল্পনার ব্যাঘাত ঘটিয়েছি বলে তখন আমার মনে খুব দুঃখ হোতো, দুঃখ হোতো তাঁকে ডেকে এনেছি অন্য জায়গা থেকে। ক্ষতিপূরণ করার জন্য আমি বলতাম:

'দাইমা, তোমার কাজ যেমন করছো তেমনি করে যাও, কোনো কিছু নিয়ে দুর্ভাবনা কোরো না। আমি যখন বড় হবো, যতদিন তুমি বাঁচবে তোমার দেখাশুনো করবো।'

তারপর গ্রামের পূর্ণবয়স্ক চাষীদের কথার ধরণটা মনে পড়ে যাওয়ায় আমি খুব জোর দিয়ে বলতাম:

'দাইমা, যখন আমি বড় হয়ে উঠবো, যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে তোমার দেখাশুনো করবো আর যখন তুমি মারা যাবে কবর দোবো তোমাকে।'

আর আমার দাইমা তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে—তাঁর সমস্ত অতীত, তাঁর অপরিপূর্ণ স্বপ্ন দিয়ে—আমার দিকে ফিরে আমাকে জড়িয়ে ধরতেন, চুম্বন করতেন এবং এই আনন্দে কাঁদতেন যে তাঁর বৃদ্ধ বয়সে তখনো একজন রয়েছে যে তাঁকে ভালোবাসবে।

আমার এখন খুব সন্দেহ হয় তরুণরা তাঁদের কথা যেভাবে ভাবে তার চেয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবস্থা অনেক ভালো। অতীতের কথা স্মরণ করার শক্তির মধ্যে একটা আনন্দ আছে, আনন্দ আছে সুদীর্ঘ বয়সের অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞ হয়ে নিজের খুসি মতো সবকিছু জিনিসকে যথাযোগ্য স্থানে সাজানোর মধ্যে।

আমার মনে পড়ে কী ভাবে আমাদের, ঊনবিংশ শতাব্দীর ছেলেমেয়েদের, মুখস্ত করতে হোতো নাইলের উর্বরতার তথ্যাবলিকে।

'কিসের মধ্যে নাইলের উর্বরতা ছিলো?' শিক্ষক প্রশ্ন করতেন।

'উর্বর পলির মধ্যে।'

এখন আমি মনে করি ইজিপ্টের নাইলের চেয়ে আমাদের নিজেদের ওকা নদীর উর্বরতা উদাহরণ হিসেবে কোনো অংশে খারাপ হবে না। বসন্তকালে বারান্দায় বেরুলে দেখা

যায় সবকিছু গেছে বদলে। কোথায় সেই অরণ্য, আর নদী, আর গ্রাম? নদীটা হয়ে উঠেছে সমুদ্র, গ্রামগুলো — দ্বীপ, আর প্রত্যেক বাড়ির সামনেই রয়েছে একটা করে নৌকো। মৌমাছিদের এই সমুদ্রের উপর দিয়ে দূরের, অদৃশ্য অরণ্যে নিয়ে যাবার জন্য।

জল যখন সরতে শুরু করে তখন আমাদের উর্বর কালো মাটির উর্বর পলি পড়ে থাকে গত বছরের ঘাসের উপর আর সমস্ত মাঠটা রূপান্তরিত হয় বিরাট বিস্তীর্ণ কালো মখমলে।

আমাদের ইস্কুলের ভূগোলে কেউ আমরা কালো মখমল মাঠের কথা পড়িনি। মাঠের উপরকার পলির এই কালো মখমলের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে, ছোটো ছেলেদের কাছ থেকে যতটা আবেগ আশা করা যায় ততটা আবেগ দিয়ে এটাকে গ্রহণ করে এক মুহূর্তের জন্যও আমরা ভাবিনি যে এটাই সেই একই পলি যা দিয়ে নাইলের উর্বরতা গঠিত। নাইলের উর্বরতার কারণ হিসেবে আমাদের প্রশ্নোত্তর অনুযায়ী আমরা ভালো খারাপ নম্বর পেতাম, কিন্তু আসলে পলি জিনিসটা যে কী সে কথা জানতাম না।

জল যখন নদীতে নেমে যেতে শুরু করতো কিংবা শুষে যেতো, বর্ষা সেই মখমলের মতো পলিকে থিতিয়ে দিতো

মাটিতে। সবুজ ঘাস ক্রমশ ঢেকে দিতো প্রাকৃতিক সারকে আর মৌমাছিরা প্রাচীন ওক আর লাইম অরণ্য থেকে ওকার পাশের মাঠগুলোর উপর দিয়ে শুরু করতো উড়তে। উইলো গাছ এপ্রিলের কনে। ফাঁকা ডালগুলোয় গোল গোল হলদে সুগন্ধী কুঁড়ির সাজ নিয়ে এখানে, ঋতু তার বসন্তের পোষাক পরার আগে, ডোবাগুলোর চারিপাশে সে অসংখ্য অঙ্কুর নির্গত করতে শুরু করে। ডোবাগুলোর পাশে পাশে ও রকম হাজার হাজার ছোটো ছোটো পুষ্পিত গাছ আছে আর প্রত্যেক গাছেরই আছে অতিথিদের ভীড়। মৌমাছি, বড় বড় মৌমাছি আর প্রজাপতি থাকে প্রচুর সংখ্যায়। চারিধারের গুনগুনানির মধ্যে প্রজাপতিদের স্তব্ধতাকে সর্বদাই বিস্ময়কর মনে হয়। তারা এপ্রিলের অকলঙ্ক কনেকে এমন আলতোভাবে স্পর্শ করে যে এইখানেই মনে হয়—'কথা রূপালী কিন্তু স্তব্ধতা সোনালী'—এই জানা কথাগুলোর অর্থ অবশেষে হয়েছিলো সম্পূর্ণ স্পষ্ট।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সূর্য, আকাশ, ফুল আর মৌমাছিরা একসঙ্গে করে যায় কাজ আর প্রতিদিন ক্রমশ বেশী পরিমাণে মধু জমে ওঠে মৌচাকগুলোয়। বহুকাল আগেই আমাদের কবিদের উচিত ছিলো ওকার মখমল মাঠের গান রচনা করা যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের

নদীকে গ্রহণ করতে পারে নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে। তা হলে তার কালো উর্বর মাটি থেকে সুদূর ইজিপ্টের নাইলের স্পষ্টতর চিত্র উঠতো ফুটে।

আর ওকার মৌমাছি-রক্ষীদের কথা। আমার সময়ে আমাদের প্রতিবেশী ইভান উস্তিনিচ'এর প্রচুর খ্যাতি ছিলো। একটা ঝোপের পিছন থেকে তাঁকে আমি আড়-চোখে চুপিচুপি দেখতাম। পাছে মৌমাছিগুলো আমাকে লক্ষ্য করে এই ভয়ে মাথা ঘোরাতে কিংবা কোনো ডালকে নড়াতে পেতাম ভয়। কখনো তিনি মৌমাছিদের কাছ থেকে নিজের মুখকে বাঁচাবার জন্য ওড়না ব্যবহার করতেন না। আর সেই মুখটাই বা ছিলো কী ধরনের! সেটা ছিলো ছোটো গাঢ় লাল একটা চাকতি, অনেকটা লাল আপেলের মতো, তার উপর পাকা দাড়ি। কিন্তু সর্বদাই তাঁর কাছে থাকতো ছোটো একটা ধুনুচি। তাঁর মৌমাছি-ধুনুচি থেকে তিনি অল্প-অল্প ধোঁয়া ছাড়তেন। কোনো কোনো দিনে হাঁটার বদলে মেয়েরা ছুটতো তাদের এপ্রনগুলো মাথার উপর ফেলে। যার সঙ্গে দেখা হোতো তাকেই তারা করতো সাবধান: 'মৌমাছিগুলো ঝাঁক বেঁধে আসছে।' কিংবা: 'উস্তিনিচ তার মৌমাছিগুলোকে তাড়াচ্ছে!' একবার আমি একটা ঝোপের পিছন থেকে দেখেছিলাম মৌমাছিদের উঠে-আসা একটি ধূসর মেঘ

আর তার মাঝখানে, দীর্ঘ আবরণমুক্ত শরীরে উস্তিনিচকে দাঁড়িয়ে থাকতে, তাঁর হাতে একটা ডালপালার ভিজে ঝাঁটা। যখন শ'য়ে শ'য়ে মৌমাছি তাঁর হাত আর গালের উপর বসলো তিনি বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করলেন না। মনে হোলো কোনো কিছু ঘটার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন যাতে এই সব হাজার হাজার জীবিত প্রাণীদের ভাগ্য তিনি মুহূর্তের মধ্যে নিজের খুশি মতো নির্ধারিত করতে পারেন! যখন তিনি স্থির করলেন যে সন্ধিক্ষণ এসেছে, ধূসর মেঘটির মধ্যে সজোরে চালালেন ঝাঁটাটা, তারপর সেটাকে জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে বারবার জোরালো জোরালো জলের ছিটে দিতে লাগলেন যতক্ষণ না মৌমাছিগুলো বেড়ার উপর গিয়ে বসতে শুরু করলো একটি কালো ঝাঁক হয়ে।

তারপরে এ ধরনের দক্ষ লোক কখনো আমি দেখিনি। যখন আমি ছেলেবেলায় মানুষদের বুঝতে ও তাদের নানা বিভাগে ভাগ করতে শুরু করেছিলাম, ভেবে নিয়েছিলাম কেউ বাঁচে শুধু নিজের জন্য, অন্যরা কাজ করে সবাইকার জন্য আর সেই কাজকে বলে 'সেবা'—আমার মনে হয় যত পূর্ণবয়স্ক মানুষদের আমি জানি তাদের মধ্যে ইভান উস্তিনিচই হোলেন একমাত্র লোক যিনি বাস্তবিকই মানুষের সেবা করেছেন।

শৈশবের সেই সুদূর দিনগুলির পর সত্তর বছর কেটে গেছে। কিন্তু এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে পাশের ওরেল'এর ভালো জাতের অশ্ব প্রজনন খামারে কী রকম সুন্দর একটা ঘোড়ার বাচ্চা জন্মেছিলো এবং কী করে কয়েক দিনের মধ্যে জানা গিয়েছিলো যে বাচ্চাটার দুটো চোখই অন্ধ। ইভান উস্তিনিচ সেই বাচ্চাটাকে নিলেন, দেখাশুনো করতে লাগলেন সেটার। সেটাকে 'অন্ধ' বলে ডাকাটাই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রাণীবৎসল। তাই তার নামকরণ তিনি করেছিলেন 'জিনা'। অল্প দিনের মধ্যেই সে তাঁর খুব উপকারে লাগলো। প্রথমতো মাঝেমাঝে সে তাকে উপহার দিতো চমৎকার দৃষ্টিসম্পন্ন বাচ্চা এবং সম্ভবত জিনা'র দরুণই মৌমাছিদের ভ্রাম্যমাণ বাসার কথাটা তাঁর মাথায় এসেছিলো।

সেই জ্ঞানী বৃদ্ধ নিজে ভেবে এই পরিকল্পনাটা বার করেছিলেন, নাকি সেটা ধার করেছিলেন, সে কথা বলা শক্ত। এটাও পরিষ্কার বোঝা যায় না যে তাঁর দোরগোড়ায় মখমল মাঠ থাকা সত্ত্বেও ইভান উস্তিনিচকে কেন অত দূরে যেতে হোতো। নিশ্চয়ই তিনি আরো ভালো একটা জায়গা আবিষ্কার করেছিলেন এবং মৌমাছিগুলোকে যাতে দীর্ঘ পথ উড়তে না হয় সে জন্য সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের। আর যাই-ই হোক না কেন, বাকহুইটের ফুল ফোটার সময়

মৌমাছিদের তো খেতে নিয়ে যেতে হবেই। যাত্রা শুরু করে ইভান উন্তিনিচ গাড়িতে মৌচাকগুলো রাখতেন উপুড় করে যাতে তাদের উপরের ফাঁকা জায়গায় মৌমাছিরা ঝাঁক বেঁধে বসতে পারে। ঝাঁকানি খাবার সময় কিংবা শব্দ বা অন্য কিছুতে বিচলিত হলে মৌমাছিদের এই ঝাঁক বাঁধার দিকে ঝোঁকটাকে সহজে বোঝা যায় যখন আমরা পশুপালদের কথা চিন্তা করি—নেকড়ের বিরুদ্ধে পশুর দল যখন ঠাসাঠাসি বৃত্তাকারে নিজেদের সাজায়; এই তুলনাটাকে আরো কাছে আনা যায় যখন আমরা নিজেদের কথা ভাবি আর মনে করি এই প্রবাদ বচনকে : যেখানে অনেক লোক সেখানে মৃত্যুকে ভয় পাই না। জিনা এখানে তাকে খুব সাহায্য করতো : অন্ধ ঘোড়াটি এতো সাবধানে পা ফেলতো যে মৌমাছিদের ঝাঁকুনি প্রায় লাগতোই না। তিনি ভ্রমণ করতেন রাত্রে; দিনের বেলায় থামতেন যেখানে থামা যুক্তিযুক্ত বলে তাঁর মনে হোতো এবং যেখানে মৌমাছিরা সোজা উড়ে যেতে পারতো আশেপাশের ফুলগুলোর কাছে আর তাদের চাকে নিয়ে আসতে পারতো মধু।

শুধু ভাবতে অবাক লাগে তারপর থেকে সত্তর বছর কেটে গেছে—উনবিংশ শতাব্দীর শেষের আর বিংশ শতাব্দীর শুরুর সেই দ্রুতগামী বছরগুলো! আমি এখন নিশ্চয় করে

বলতে পারি না ইভান উস্তিনিচ মৌমাছিদের ভ্রাম্যমাণ বাসার কথা শুনেছিলেন কিনা কিংবা নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন এই পদ্ধতির কথাটা। এ কথাও বলতে পারি না অন্য কোনো লোক, তাঁর কোনো প্রতিবেশী, এই আবিষ্কারকে লক্ষ্য করে নিজের নামের সঙ্গে সেটাকে যুক্ত করে কাজে লাগিয়েছিলো কিনা, আমেরিকা আবিষ্কার করার সময় যে ঘটনা ঘটেছিল সে-রকম। কোনো রকম নিশ্চয়তার সঙ্গে আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারি না, কী জানি কেন এ ব্যাপারে আমার কোনো কৌতূহল নেই। আমার মনে হয় মৌমাছিদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে মানুষের নিজের প্রকৃতিটা হয় প্রভাবিত। মৌমাছিরা আমাদের শেখায় হঠকারীর মতো এগিয়ে না যেতে, আচমকা নড়াচড়া না করতে এবং শারীরিক শক্তির চেয়ে মানসিক শক্তির উপর বেশী নির্ভর করতে। এ কারণেই আমার কাছে এটা পরিষ্কার বলে মনে হয় যে ইভান উস্তিনিচ নিজেকে মৌমাছি পোষার নতুন পদ্ধতির আবিষ্কারক বলে কখনো কোনো দাবী করেননি। এই আবিষ্কারের সঙ্গে কার নামটা যে যুক্ত হোলো তাতে তাঁর কী আসে যায়? উক্ত পদ্ধতিকে প্রথম তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন, এই প্রথম স্থান সর্বদাই তিনি অধিকার করে থাকবেন।

২

এখন যখন আমি ভাবতে বসি, আমি যেন এক টেলিভিসনে দেখতে পাই আমার প্রাচীন দেশকে আর বুঝতে পারি সর্বদাই আমার দেশকে আমি ভালোবেসে এসেছি, কিন্তু সর্বদাই আমার মনে হয়েছে কী যেন নেই, ফলে, তাকে নিয়ে নিজে আমি গর্ব করতে পারিনি, এমন কি অন্যদের প্রশংসার উপরেও পারিনি বিশেষ আস্থা স্থাপন করতে। কোনো এক নতুন আর ভালো স্বদেশকে আবিষ্কার করার জন্যই কি উত্তরে ঘুরে বেড়াইনি আর প্রাচীন কাহিনী লিখে চলিনি? কিন্তু কাহিনীগুলো কিংবা উত্তরাঞ্চলের প্রকৃত দৃশ্যের চমকপ্রদ সৌন্দর্য—কোনোটাই কাজে লাগেনি। এই সব কাহিনী আর অতি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মর্মস্থল অবশ্যই মানুষ, এবং আমার স্বাভাবিক স্বদেশের মানুষের চেয়ে মধ্য রাত্রির সূর্যালোকে আর উত্তরাঞ্চলের জ্যোতিতে এই মানুষগুলিকে আরো বেশী করুণ জীব বলে মনে হয়। আমার দেশে অন্তত নাইটিঙ্গেল গান গায়, আপেল গাছে ফুল ফোটে, এদিকে উত্তরাঞ্চলে কিন্তু মধু আহরণ করার জন্য এমন কি মৌমাছিও নেই।

এখন, আমার স্বদেশের সমস্তটা আমার সামনে প্রসারিত হওয়ায়, আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি যে এমন কি তখনও উত্তর

অঞ্চলে আমি আমার নিকট আর প্রিয় কোনোকিছুকে আবিষ্কার করেছিলাম। তা না হলে কেন প্রায় দৈনন্দিন এতো সব বিরাট বিরাট আবিষ্কারের মধ্যে সুমেরুর মধু আমার উপর অমন গভীর প্রভাব বিস্তার করবে যে আমি সমস্ত পৃথিবীকে জানাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবো কী করে সেটা আবিষ্কৃত হয়েছিলো এবং যে লোকেরা সেটি আবিষ্কার করেছিলো তারা কী চমৎকার ধরনের।

আমি এটা যখন লিখছি আমার টেবিলের উপর স্ফটিক পাত্রে রয়েছে এক উপকারী, মিষ্টি আর সুগন্ধী দ্রব্য! তার উপরে মাথার উপরকার বৈদ্যুতিক আলো হচ্ছে বিচ্ছুরিত। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ সেটাকে জানে, আর যেদিন প্রথম মৌমাছি প্রথম ফুলের উপর বসেছিলো সেদিন থেকেই আছে তার অস্তিত্ব। কিন্তু এই সুপরিচিত দ্রব্যটি, বহুকাল থেকে যার অস্তিত্ব আছে, এখন আমাদের কাছে এমন এক জায়গা থেকে আসে যেখানে ইতিপূর্বে মৌমাছিদের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। যে প্রচুর পরিমাণ সুধা তুন্দ্রা'র * মধু-ভরা ফুলের মধ্যে নিহিত ছিলো মৌমাছিদের বিনা সহায়তায় মানুষের কাছে ছিলো অলভ্য। আর এই মধুকে, আমার

---

* সুমেরু অঞ্চলের বৃক্ষশূন্য বিশাল প্রান্তর।

টেবিলের উপর স্ফটিক পাত্রে যেটি ঝকমক করছে, বাস্তবিকই বলা যায় একমাত্র শুধু মৌমাছিদের দ্বারাই সৃষ্ট নয়, প্রধানত মানুষের প্রচেষ্টা দ্বারাই সৃষ্ট, যারা আমাদের ওকা খাঠের রুশ মৌমাছিগুলিকে কাজে লাগিয়েছিলো মেরু অঞ্চলে খিবিনি পাহাড়ের পাদদেশে, মঞ্চেগোর্স্ক-এর কাছেপিঠে, সুদূর মুর্মানে, এবং আরো উত্তরে, বারেনৎস সমুদ্রের ওপারে পেচেঙ্গায় প্রায় সপ্তদশ সমান্তরাল রেখার কাছে।

যার সঙ্গে স্বাদ, গন্ধ ও রঙের সম্বন্ধ আছে সে রকম কোনো জিনিস সম্পর্কে যথাযথ কিছু বলা কঠিন। কারণ বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি। আরো বেশী কঠিন হবে তুন্দ্রার মধু সম্বন্ধে বলা, যে মধুর স্বাদ আগে কেউ কখনো গ্রহণ করেনি, যে মধুর অস্তিত্ব আগে কখনো ছিলো না। কঠিন হলেও এ ধরনের অভূতপূর্ব জিনিস সম্পর্কে, যার সম্বন্ধে আগে কখনো কিছু বলা হয়নি, প্রথম বলতে যাওয়াটা ভারি লোভনীয় আর চিত্তাকর্ষক। আমার মনে হয় আমাদের দেশের মধুর চেয়ে সুমেরুর মধুর স্বাদটা অনেক ভালো, আর দক্ষিণের ও সুমেরুর মধুর প্রভেদটা হোলো প্রায় আলো সম্পর্কে উত্তর আর দক্ষিণের প্রাকৃতিক দৃশ্যের পার্থক্যের সমান। দক্ষিণের শিল্পীরা যেটাকে মনে করে রঙের আমেজ, সেটাই উত্তরে ভেঙে যায় দশটিরও বেশী মাত্রায়। ফলে

আলো দারুণ কোমল আর সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে, আর শুধু আলোই নয়, ছায়া, মেঘ, জল আর পাহাড়গুলিও। উত্তরের সবকিছুই বেশী কোমল, বেশী সূক্ষ্ম, প্রকৃতির চেয়ে মানুষকে চোখে পড়ে বেশী করে, দক্ষিণের নিশ্চেষ্ট আনন্দের চেয়ে সেখানকার আনন্দের নিকটতর সম্পর্ক মানুষের পরিশ্রমের সঙ্গে।

যার অস্তিত্ব ছিলো না তাকে অস্তিত্বময় করে তোলার মানুষের প্রচেষ্টার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই মধুকে, মেরুর তুন্দ্রার ফুল থেকে যাকে আহরণ করা হয়েছে, আমার সবচেয়ে বেশী হৃদয়গ্রাহী মনে হয়।

৩

এখন আমরা জানি যে মেরুর তুন্দ্রার ফুলের মধ্যে বছরে বহু লক্ষ টনের মধু নিহিত আছে। এখন দৃঢ় বিশ্বাসে বলা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে উত্তরের প্রত্যেক বাসিন্দাই তার টেবিলে যতটা উত্তরের বৈশিষ্ট্যময় আর প্রথম শ্রেণীর মধু পেতে চায় ততটা পাবে।

আমাদের দেশের হালের অসংখ্য আবিষ্কারের মধ্যে এটিকে কেউ প্রায় লক্ষ্য করেনি, কেউ জানে না মেরু বৃত্তের এই নতুন মধু এলাকার কে কলম্বাস। আমেরিকা আবিষ্কারের শুরু থেকে পৃথিবীতে বহু আবিষ্কার হয়েছে, যেগুলি নতুন

পথ অবারিত করেছে সম্পূর্ণ নিরপরাধ এক জাতিকে লুঠ আর ধ্বংস করার জন্য। সৎ লোকদের এখন সময় হয়েছে ও ধরনের গৌরবকে অস্বীকার করার আর এ কথা বোঝার যে সব সৃজনশীল কাজই অবধারিতভাবে নিয়ে চলে আবিষ্কারের দিকে। কিন্তু কর্মীর সম্মানিত নামকে বিস্মৃতির গহ্বরে কখনো তলিয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়। যে কেউই কোনো আবিষ্কারের কথা লিখবেন তাঁরই উচিত তার সঙ্গে যুক্ত নামগুলিকে আবিষ্কার করা।

এ কথা অবশ্য বলা কঠিন মধুর জন্য উত্তরের অধিবাসীরা কাকে বেশী ধন্যবাদ জানাবে: কৃষিবিৎ ভ. দেমিদেঙ্কো'র কাছে, ১৯৩৪-এ গ. আঙ্কিনোভিচ আর ভ. নাউমোভ'এর সঙ্গে যিনি মেরু অঞ্চলে মৌমাছিদের নিয়ে গিয়েছিলেন পনের দিনের জন্য; বা স. লোজিস'এর কাছে, যিনি হলেন 'ইণ্ডাস্ট্রিয়া' রাষ্ট্রীয় খামারের প্রধান কৃষিবিৎ; বা মস্কোস্থিত প্রকৃতি রক্ষা সমিতি; বা মুর্মান্স্কের আঞ্চলিক কার্য-নির্বাহ সমিতির উৎসাহী বৃন্দ এবং কম্যুনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক কমিটির কাছে। জীববিদ্যার ডক্টর উপাধিপ্রাপ্ত গ. আভেতিসিয়ান মৌমাছিপালন ইন্‌স্টিটিউটের সদস্যদের মধ্যে উত্তর দিকে মৌমাছিদের অগ্রগতির কাজে বিখ্যাত হয়েছিলেন। প্রখ্যাত আলাগেজ পর্বতের কাছাকাছি

জায়গায় রৌদ্রোজ্জ্বল দেশে তিনি মানুষ হয়েছিলেন ও শিক্ষা পেয়েছিলেন। উক্ত প্রাচীন সংস্কৃতির দেশে, আরারাট পর্বতের কাছে নিজের জীবনকে কাটানোটাই যথেষ্ট সৌভাগ্য বলে মনে হবার কথা। কিন্তু এই মৌমাছি-প্রিয় লোকটি মেরু অঞ্চলে খুঁজে পেয়েছিলেন আনন্দ, সেই তুন্দ্রায় যেখানে কুড়ি সেণ্টিমিটার বেড়ে উঠতে একটা বার্চ গাছের লাগে অর্ধ শতাব্দী।

ডাঃ আভেতিসিয়ান আমাদের বলেছিলেন, 'এ ব্যাপারে অবাক হবার কিছু নেই। উত্তর আর দক্ষিণের আবহাওয়া শুধু ভূপৃষ্ঠের অক্ষাংশের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে উচ্চতার উপরে। এটা খুবই সম্ভব যে আলাগেজ পর্বতে নির্দিষ্ট উঁচুতে কুড়ি সেণ্টিমিটার দীর্ঘ সেই একই রকম বুড়ো বার্চ গাছ দেখা যেতে পারে।'

আমাদের এই আলোচনা থেকে এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যে কোনো দিক দিয়েই লোকে চলুক না কেন—সমতলভূমিই হোক কি পাহাড়ই হোক—যা অজানা, যার অস্তিত্ব নেই, যা নতুন তার চালক-শক্তির হওয়া প্রয়োজন নিজের দেশের প্রতি জটিল অনুভূতির একাংশ।

১৯৪৯-এ ডাঃ আভেতিসিয়ান মেরু অঞ্চলে গিয়েছিলেন। মৌমাছিদের কয়েকটি ঝাঁক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার

ফলে তিনি মুর্মানস্ক অধিবাসীদের এমন স্বদেশ-প্রেমিক ভাবাবেগকে জাগ্রত করেছিলেন যে তারা সুমেরুর মধুর পরিকল্পনার কথাটা সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলো। এখন বলা শক্ত উত্তরের মানুষরা সুমেরুর মধুর সীমাহীন ভাণ্ডারের জন্য কার কাছে বেশী কৃতজ্ঞ—বৈজ্ঞানিক চিন্তা না স্থানীয় লোকদের স্বদেশ-প্রেমিকতা।

কিন্তু সুমেরুর মধুর এই আবিষ্কারকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে একটি হারের মতো, যার সংযোজকগুলি নির্দিষ্ট কতকগুলি লোকের প্রচেষ্টা। ইচ্ছে করে সেই সব লোকদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন অন্তত তাঁদের কয়েক জনের নাম করতে, আর ইচ্ছে করে তাঁদের একজনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে যেতে যতক্ষণ না আমরা পৌঁছই সুমেরুর মধুতে।

আমার নিজের ইচ্ছে করে এই আবিষ্কারের সত্য গল্পটিকে এমন ভাবে বলতে যাতে খুঁটিনাটি কোনো ঘটনাকে উদ্ভাবন করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন না হয়।

আমার মনে হয় কোনো লেখক যদি ঘনিষ্ঠভাবে জীবনের নিকট সংস্পর্শে আসতে পারে এবং যার অস্তিত্ব ছিলো না তার জন্মের নিজে হয় দর্শক তা হলে লেখকের সমস্ত উদ্ভাবনগুলি হয়ে ওঠে হাস্যকর আর অপ্রয়োজনীয়।

পাঠকের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই বলেই তাকে আমি গল্পের শেষটা বলবো — সেই মধু হয়েছিলো আবিষ্কৃত। এই নবজন্মের দর্শক হিসেবে আমার কাজ কী করে সেটা জন্মালো এবং এই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করার জন্য কোন কোন মানুষের প্রশংসা পাওয়া উচিত সেটা বর্ণনা করা।

৪

ডক্টর যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলো এই:

'সুমেরু অঞ্চলে দিনে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে সূর্য মিথ্যেই উঠে থাকে না, আর মিথ্যেই এই ঘণ্টাগুলোর সমস্তক্ষণ ধরে উদ্ভিদরা কাজ করে যায় না: দক্ষিণের চেয়ে উত্তরের ফুলে আছে বেশী সুধা। দক্ষিণের দীর্ঘ গ্রীষ্মের চেয়ে উত্তরের অল্পস্থায়ী গ্রীষ্ম বেশী মধু দিতে পারে।'

খাঁটি কথা। কিন্তু সেগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে স্থানীয় সাধারণ অধিবাসীর বিশ্বাস কী করে উৎপাদন করা যায়, যারা ভালো করেই জানে যে শুধু দশই জুন থেকে বার্চ গাছগুলোয় জন্মায় নতুন পাতা, আর জুলাইয়ের শেষ থেকে সেগুলোর রঙ শুরু করে হলদে হতে? এই খাঁটি কথাগুলোকে কী করে বিশ্বাস করা যায় যখন মৌমাছিরা মধু আহরণ করতে

শুরু করে শুধু জুনের মাঝামাঝি থেকে আর শেষ করে অগস্টের শুরুতে?

এখানকার অধিবাসীরা বিনা সাহায্যে বহুকাল সংগ্রাম করেছে অরণ্য, জল আর পাথরের সঙ্গে। কথাটা সত্যি যে এখন প্রভুকে অনুভব করা যাচ্ছে অরণ্য, জল আর পাথরের মধ্যে। কিন্তু এই প্রভু সমস্ত জিনিসগুলোর মূল্য ভালোই জানেন এবং যে সব কথা বলা হচ্ছে তাতে বিশ্বাস আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিরাট অঙ্কের টাকা দিতে সহজে রাজি নন।

প্রধান কথাটা এই মধুটা ততটা নয় যতটা আমাদের সুমেরুর রাত্রি আর দিনের পরিশ্রমটা পুরস্কৃত হতে পারে মধু দিয়ে, এবং আমরাও এখানে অন্যান্য লোকেদের মতো বেঁচে থাকতে পারি আর পরিশ্রমের সাহায্যে কোনো কিছু লাভ করতে পারি।

উক্ত ডক্টর বলেছিলেন, 'প্রকৃতিকে পুনর্গঠন করার পরিকল্পনাটা মধ্য রাত্রির সূর্যের আলোয় স্পষ্টতর — সুমেরুর রাত্রে বিদ্যুৎ জ্বলে উজ্জ্বলতরভাবে।'

'খাঁটি কথা, ডক্টর!' তিনি যে কথা বলেছিলেন তার সত্যতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। 'মধুময় কথাগুলো! কিন্তু মধু পাওয়া যাবে কি?'

'শরৎকালের মধ্যে আপনি মধু পাবেন', ডক্টর কথা দিলেন।

তারপর নানা ঘটনা ঘটতে লাগলো! প্রথম সুমেরু অভিযান মৌমাছিদের পাঁচটি ঝাঁক নিয়ে এলো 'ইওাস্ট্রিয়ায়', কোলা উপদ্বীপের বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় খামারে। এই অভিযান সংগঠিত হয়েছিলো 'প্রকৃতি রক্ষা সমিতি' এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকদেমির অঙ্গসংস্থান ইনস্টিটিউট দ্বারা। এই অভিযানের মধ্যে ছিলেন তিমিরিয়াজেভ আকদেমির মধুমক্ষিকালয়ের দু'জন কর্মী—গ. আস্কিনোভিচ আর আ. লিউবিমোভ এবং স. খলুয়েভ নামে এক শিক্ষক।

'ইওাস্ট্রিয়া' রাষ্ট্রীয় খামারের সদস্যরা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করেছিলেন, আর যখন খিবিনি পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলের রঙ পালিশ-করা তামার মতো হয়ে উঠলো তখন অভিযানের নেতা আভেতিসিয়ান সুমেরুর মধুর একটি শিল-মোহর-করা মধুচক্র বার করে মুর্মানস্কের কর্তৃপক্ষদের দেখাতে নিয়ে গেলেন।

যখন তারা তাদের স্থানীয় সুমেরুর মধুর স্বাদ গ্রহণ করলো তখন মুর্মান্স্কের অধিবাসীদের বিস্ময়ের কথাটা অনুমান করা কঠিন নয়। সেই প্রথম গ্রীষ্মকালের মৌমাছিদের নিয়ে পরীক্ষা করার আমাদের সত্য গল্পের চেয়ে কোন

রূপকথার গল্পের শেষটা আরো চমৎকার হতে পারে? ১৯৫০-এ ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংগঠন সম্পর্কে মুর্মানস্ক সোভিয়েতের কার্য-নির্বাহক সমিতি এবং আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টি কমিটি ১৯৪৯-এর ৩রা সেপ্টেম্বরে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলো খিবিনি পাহাড়ে, মুর্মানস্কের কাছে, মঞ্চেগোর্স্কে এবং পেচেঙ্গায় মধুমক্ষিকালয় গঠন করা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন যে এই প্রস্তাবের আনন্দোৎসবের সঙ্গে মুর্মানস্কের কোনো বিখ্যাত ছুটির দিন মিলিত হয়েছিলো। যুবকরা ঢোলা পাৎলুন পরে মেয়েদের হাত ধরাধরি করে বেড়িয়েছিলো। মেয়েদের হাতে ছিলো মেরু সমুদ্রের তীরের স্থানীয় উষ্ণগৃহে জন্মানো এক এক গুচ্ছ প্যানসি।

৫

এক শ' মৌমাছির ঝাঁক কেনা এবং সেগুলিকে সুমেরু মধুমক্ষিকালয়ের প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্তের অল্প পরেই প্রশ্ন উঠলো কোন জায়গা থেকে সবচেয়ে ভালো মৌমাছি পাওয়া যায়। এই প্রশ্নটিকে নানাভাবে বিচার করা হোলো। সবাই এক মত হলেন যে প্রথম ও প্রধান কাজ মৌমাছিদের তুষারে অভ্যস্ত হওয়াটা। ককেশাস,

ইউক্রেন এবং সমস্ত দক্ষিণের প্রদেশগুলিকে বাদ দিয়ে দেওয়া হোলো। তারপর রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কৃষি মন্ত্রি-দপ্তরের মধুমক্ষিকালয় বিভাগ প্রস্তাব করলো যে মস্কো প্রদেশে মৌমাছিদের আমদানি করতে। খানিক ইতস্তত করার পর সবাই এক মত হলেন যে ওকার তীরের সেই মখমল মাঠ থেকে মৌমাছিদের আনা দরকার, যেখানে আমার শৈশবে আমাদের স্থানীয় মধুমক্ষিকা বিশারদ উস্তিনিচ ঘুরে বেড়াতেন তাঁর বিখ্যাত অন্ধ ঘোড়া জিনাকে নিয়ে। এইভাবে যে সব ঘটনায় সুমেরুর মধু আবিষ্কার চিহ্নিত হয়েছিলো সেগুলি আমার জীবনের ঘটনাবলির সঙ্গে গিয়েছিল মিলে। আমি অনুভব করেছিলাম সম্পূর্ণ নতুন ও অভূতপূর্ব জিনিসের উত্তরাধিকারী বলে। মনে মনে বলেছিলাম, 'চমৎকার মানুষদের হাতের তলায় এই যে সব নতুন জিনিস জন্মেছে সেগুলির বর্ণনা যদি করি, যার মধ্যে কাহিনীর ছিটে-ফোঁটাও নেই, তা হলে নিশ্চয়ই আমার গল্পটি রূপকথার চেয়ে কোনো অংশে কম চিত্তাকর্ষক হবে না!'

এতো দূরে এক শ'টি মৌমাছির ঝাঁক স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনাটি ইভান উস্তিনিচের ভ্রমণের চেয়ে আসলে আলাদা নয়। তফাৎটা শুধু এই যে এবার মৌমাছির সংখ্যাটা বেশী, আর তাদের স্থানান্তরিত করা হয়েছিলো অন্ধ

ঘোড়ায় টানা গাড়ির বদলে আধুনিক যানবাহনে, যেতে হয়েছিলো বহুদূরে—ওকা থেকে সুমেরু প্রদেশে।

এইভাবে সে বছর বসন্ত এলো। সুদূর উত্তরে মৌমাছিদের আমদানি করার পৃথিবীর মধ্যে প্রথম পরীক্ষার কাজ পরিচালনা করা হোলো মুর্মানস্কে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলো একটি বাধা : সেখানে মৌমাছি থাকবে কিন্তু মৌমাছিদের তদারক করার লোক থাকবে না। তাই 'ইণ্ডাস্ট্রিয়ায়' মৌমাছির তদারক করার ক্লাস শুরু করা হোলো।

দাঁড়কাক কিংবা তোতাপাখীকে কথা বলা শেখানো যায়, মানুষের চেয়ে বেশী নিখুঁতভাবে যন্ত্র লিখতে পারে। কিন্তু এখানে প্রয়োজন সৃষ্টি করা এমন বুদ্ধিজীবি মানুষদের, যারা কাজ করবে দাঁড়কাক কিংবা যন্ত্রের মতো নয়, শুধু মানুষ হিসেবে, প্রকৃতির প্রভু হিসেবে।

হাজার হাজার বছর ধরে প্রতি বছর প্রথম বসন্তের প্রায় একই দিনে উত্তরে দেখা দিয়েছে এক ধরনের শাদা পাখীর ঝাঁক, গলে-যাওয়া তুষারের উপর দেখা দিয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে কালো কীটপতঙ্গ, তারপর ভরত পাখী শুরু করেছে গান গাইতে, বার্চ গাছে ফুটেছে ফুল। আর এই হাজার হাজার বছর ধরে পাখী আর কীটপতঙ্গ দেখা দিয়ে হয়েছে অদৃশ্য, ফুল ফুটে গেছে ঝরে ঋতু অনুসারে। তারপর

এসেছে মানুষ। তারা লক্ষ্য করে লিখতে শুরু করেছে পাখীদের দেশান্তরে যাবার তারিখ, কোন কোন ফুল ফোটে আর কখন, কখন স্থানীয় বড় বড় মৌমাছিগুলো উড়ে যায় ফুলের উপর দিয়ে, আমাদের আমদানী-করা মৌমাছিগুলো কখন তাদের চাকগুলো ছাড়ে আর পরীক্ষামূলক চাকে কতটা পরিমাণ মধু হয় জমা। এই সব তথ্যগুলি টুকে রাখা খুব কঠিন কাজ বলে মনে না হতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে এটা বৈজ্ঞানিক কাজের দিকে এক পা অগ্রসর হওয়া, যে নিয়ম প্রকৃতিকে শাসন করছে সেটাকে আবিষ্কার করা। এইভাবে একদা যে মধুর অপচয় হোতো তাকে সংগ্রহ করার জন্য প্রকৃতিকে পুনর্গঠন করার কাজকে শুরু করতে হয়েছিলো স্বয়ং মানুষকে পুনর্গঠন করার সঙ্গে।

উত্তরের এই সরল কর্মীদের স্থির করতে হয়েছিলো কোলা উপদ্বীপে মৌমাছি-পালনের ভবিষ্যৎ।

নিজেদের জন্য মধু তারা চায়নি। প্রত্যেকে নিজেদের যেটা সবচেয়ে ভালো চেয়েছিলো সেটা এই পর্যন্ত যে এটা তার বাকী সব কমরেডদের উপকার করবে। আমার মনে হয় বিজ্ঞানের মন্দিরে সবে প্রবেশ করার সময় সরল মানুষরা সর্বদাই এ রকম ছিলো। কিন্তু সরল মানুষ ছাড়াও অন্যরাও সেই একই পথের উপর দিয়ে গিয়েছে, শেষ পর্যন্ত যেটা

বিভক্ত হয়ে চলে গিয়েছিলো দু'টি দিকে — আমাদের লক্ষ্যস্থলের দিকের কঠিন পথ আর নেকড়ের মুখের কাছে-যাওয়া সহজ পথ।

ডক্টরের ছাত্ররা গ্রহণ করেছিলো কঠিন পথ। উত্তরের মধু আবিষ্কার সম্বন্ধে যদি কেউ কোনো বই লেখেন তা হলে লিখতে হবে প্রত্যেক মানুষের মনস্তত্ত্বের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের কথা। এটা এখন বোঝা যাচ্ছে কেন এই পথে নানা নাম গজিয়ে ওঠে: সবাইকার নাম করা সম্ভব নয়, তাই সবচেয়ে ভালো নামের মধ্যে আমাদের সীমাবদ্ধ করতে হবে।

সবাইকার প্রতিনিধি হিসেবে তাই একটি মহিলার নাম নিশ্চয়ই উল্লেখ করতে হবে: আন্না সোমভা, দনের একটি কসাক মেয়ে, এক সব্জী রোপণ-করা দলের নেতৃ। সব্জী বাগানের উপর মৌমাছিদের ঘোরা-ফেরা লক্ষ্য করে তিনি নিখুঁতভাবে দেখেছিলেন তাদের শসার পরাগযোগ। এখন এ কথা বলা কঠিন উত্তরের মানুষদের পক্ষে কোনটি বেশী হিতকর: মৌমাছিরা যে মধু আহরণ করেছিলো সেটা না উদ্ভিদে তাদের পরাগযোগ। আন্না এ কথা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে একটি মৌমাছি ঝাঁকের কাজ এক শ' কুড়ি জন মানুষের কাজের সমান, যারা হাতে করে শশার পরাগযোগ করে থাকে।

যখন হরিণদের সবচেয়ে বেশী বাচ্চা প্রসব করার সময় তখন এলজা বিত্রিয়াকোভা নামে বলগা-হরিণ সম্বন্ধে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও উদ্যমশীলা এক মহিলাকে তুন্দ্রা থেকে ডেকে আনিয়ে মস্কোতে পাঠানো হয়। আমরা, যারা মস্কোতে ছিলাম, আশা করেছিলাম বলগা-হরিণের পোষাক-পরা কোনো আধুনিক আমাজনের মতো কাউকে দেখবো। কিন্তু সুন্দর নীল কোট পরা একটি মেয়েকে দেখে আমরা বিস্মিত ও খুসি হলাম। তাঁর মুখটি মিষ্টি। তাঁর হাতে যথারীতি মেয়েদের অতি প্রিয় ও অসুবিধেজনক একটি হাত-ব্যাগ। এমন একটা কাজে তিনি এসেছিলেন যার জন্য হাত-ব্যাগের দরকার — টাকার ব্যবস্থার জন্য। ব্যাঙ্কের ধার আর মৌমাছিদের নিয়ে যাবার জন্য রেফ্রিজারেটার-ভ্যান ঠিক করার পর তাদের জন্য ঠিক মতো তদারককারী খুঁজে বার করার অসুবিধেটা দেখা দিলো; এমন একজন লোকের প্রয়োজন যিনি মৌমাছি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং এমন উৎসাহী যিনি এই মহামূল্য মালকে মেরুতে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। মনে হোলো এ কাজের জন্য ইভান উস্তিনিচকে পুনরুজ্জীবন করা এবং তাঁকে কলেজের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কারণ কাকে পাওয়া যাবে যিনি রাজী হবেন গাড়িতে করে মৌমাছিদের অরণ্য থেকে বহু কিলোমিটার দূরে নিয়ে যেতে, তাদের

সঙ্গে হাজার হাজার কিলোমিটার ট্রেনের ঝাঁকুনি খেতে খেতে যাবেন, তাদের পাশে বসে রেফ্রিজারেটার-ভ্যানে কাঁপবেন, তারপর বারেণ্ট্স্ সমুদ্রে জাহাজে তাদের সঙ্গে দুলবেন, আর তারপর আবার লরিতে করে অসমান পথের উপর ঝাঁকুনি খেতে খেতে যাবেন পেচেঙ্গায়?

অবস্থাটা ছিল যুদ্ধের সময়কার মত যখন সবচেয়ে বিপদ-জনক কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজন। মস্কোতে তখন ছিলো নানা ধরনের স্বেচ্ছাসেবক। তাদের মধ্যে অবশ্যই ছিলো মৌমাছি-বিশারদ। অল্প সময়ের মধ্যেই জানা গেলো যে ইভান উস্তিনিচকে পনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজন নেই। আমরা, সবাই যারা মৌমাছি ভালোবাসি, অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম যে সেই সময় আমাদের মধ্যেই ছিলো সে ধরনের একটি লোক, শুধু কেউ জানতো না তিনি কে। অতিরিক্ত বিনয় ছিলো বলে তিনি এগিয়ে আসেননি। কিন্তু যখন সময় এলো কর্তৃপক্ষ তখন তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন। দেখা গেলো তিনি আর একজন ইভান উস্তিনিচ, শুধু তাঁর থুৎনিতে ছোটো গোঁজের মতো পাকা দাড়ি, আর বাইরে থেকে তাঁকে দেখতে মাঝবয়সী সুশিক্ষিত লোকের মতো। কিন্তু তাঁর হৃদয়টা, ইভান উস্তিনিচের হৃদয়ের মতো একেবারে একটা নিখুঁত মৌচাক, মৌমাছিদের ছন্দময় গুনগুনুনিতে

ভরা। কিন্তু আমার মনে হয় কন্‌স্টান্‌টিন রোদিওনোভ'এর হৃদয়টা ইভান উস্তিনিচের চেয়েও ছিলো দয়ালু।

উস্তিনিচের দরকার হোতো মৌমাছিদের দেখতে, শুনতে আর তাদের ধোঁয়া দিতে। কিন্তু রোদিওনোভ ছিলেন মৌমাছি-পালন ইন্‌স্টিটিউটের একজন বৈজ্ঞানিক কর্মী। মৌমাছিদের না দেখেও তিনি তাদের ভালোবাসতেন। মৌমাছিদের সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের আতিশয্যের জন্য ইন্‌স্টিটিউটে সবাই তাঁকে বলতো 'শেষ মোহিকান'। কিন্তু আমরা নিজেরা এবং সমস্ত সুমেরু অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁকে আর ডাঃ আভেতিসিয়ানকে মনে রাখবো প্রথম মোহিকান বলে, যাঁরা এমন জিনিসের প্রবর্তন করেছিলেন যা উত্তরে অভূতপূর্ব।

আমাদের মধ্যে কে বলতে পারে আমরা যখন 'মোহিকান' কথাটি ব্যবহার করি তখন কী ভাবি? আমার মনে হয় কোনো কিছু খুব ভালো জিনিসকে আমরা বোঝাতে চাই, যেটা পৃথিবী থেকে অনিবার্য ও অন্যায়ভাবে নির্বাসিত হতে চলেছে। শুধু তাই নয়—আমরা জানি মোহিকানদের বাদ দিয়ে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবেই। কিন্তু ওই মানসিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে আমি মানিয়ে নিতে কখনো পারি না। শৈশবে আমি যখন উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের কথা পড়েছিলাম আমার মনে হয়েছিলো

স্বাধীনতার জন্য তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমি যেন লড়াই করছি।

এটা দৈবাৎ ঘটেনি যে আমাদের প্রথম মোহিকানটি যে মুহূর্তে তার স্বদেশের দিগন্তকে প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছিলো, সেই মুহূর্তে সে এমন একটি শক্তির সম্মুখীন হয়েছিলো যেটা স্বদেশের দিগন্তকে প্রসারিত করার ইচ্ছে না করে চেষ্টা করেছিলো সবকিছুকে তার বর্তমান অবস্থায় রাখতে। ওকার জেলা কৃষি বিভাগের ম্যানেজার রোদিওনোভকে এক শ'টি মৌমাছির ঝাঁক বিক্রি করতে অস্বীকার করেন। তখনই রোদিওনোভের এক টেলিগ্রাম পেয়ে তুন্দ্রা থেকে এলজা ছুটে আসেন হাঁপাতে হাঁপাতে।

এই একাগ্রচিত্ত মেয়েটির মধ্যে কী যাদু শক্তিই না ছিলো। তুন্দ্রা থেকে আগত এলজা মেরুকে মানুষের জয় করার পরিকল্পনায় পরিপূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছিলেন। যখন তাঁকে বলা হোলো যে ওকার বিত্তশালী যৌথখামারগুলি সুমেরুর জন্য এক শ'টি মৌমাছির ঝাঁক দিতে পারবে না তখন তিনি এমন উপহাসের হাসি হেসেছিলেন যে ম্যানেজার হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন।

বাস্তবিকই নতুন সোভিয়েত পদ্ধতির এই তরুণী মহিলাটির দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় ম্যানেজারের দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো গ্রাম্য ধরনের,

অরণ্যের আঁকাবাঁকা সীমারেখা দিয়ে ঘেরা। তুন্দ্রা থেকে আগত এলজা, কোনো অরণ্য যাকে ঘিরে নেই, সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বুঝে সোজাসুজি বললেন:

'কমরেড! আপনাদের বেড়াগুলো ভেঙে ফেলুন!'

এই কথাটা শুনেই ম্যানেজার হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন।

এলজা কিন্তু বলে চললেন:

'ওকার মাঠে ধনী যৌথখামার দিয়ে আপনারা নিজেদের চারদিকে বেড়া তুলেছেন। কিন্তু আপনারা আপনাদের মখমল মাঠ থেকে যত মধু পান আমরা আমাদের তুন্দ্রায় তার চেয়ে বেশী মধু সংগ্রহ করতে চাই। আমাদের সময়কার পরিকল্পনা-গুলোর এটা কি অন্যতম নয় যে পিছিয়ে-থাকা লোকদের সামনে আসা দরকার?'

এইবার ম্যানেজার এলজার কথাটা বুঝলেন এবং তাঁর বাধা দেওয়াটাকে ব্যাখ্যা করলেন নিজের জেলাকে রক্ষা করার সংগ্রাম বলে।

'আপনাদের মধু নষ্ট হবে না', এলজা উত্তর দিলেন। 'এর ফলে ওকা বিখ্যাত হয়ে যাবে।'

ম্যানেজারের শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ ফিরে এলো। তিনি উত্তর দিলেন:

'আমাদের মখমল মাঠ আপনাদের মেরুর তুন্দ্রার সঙ্গে অভিনন্দন বিনিময় করবে।'

এই রকম নিপুণভাবে আমাদের স্থানীয় যোগ্য কর্মী নিজের বেড়াটা লাফিয়ে পেরুলেন, আর তুন্দ্রা থেকে আগত এলজা মখমল মাঠে মধু-ভরা ফুলের নমুনার একটা বিরাট তোড়া সংগ্রহ করে গেলেন চলে।

৬

সেই গ্রীষ্মে বর্ষার দরুন মাঠের ঘাস কাটা কিছু পরে হয়েছিলো। কিন্তু ঠিক যখন মৌমাছিদের চালান করার জন্য রোদিওনোভের সাহায্যকারীর প্রয়োজন বর্ষা হঠাৎ থেমে গেলো আর আমাদের অঞ্চলের স্মরণাতীত কাল থেকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ছেলে বুড়োর দল ছুটলো মাঠে। মৌমাছিদের চালান দিতে দেরী করা আর অসম্ভব: বর্ষার দিনে তারা তাদের সঞ্চিত খাদ্য খেয়ে ফেলছে, ভালো আবহাওয়ার জন্য আশা করার সময় আর নেই। যে খাদ্য রয়েছে সেটা যাত্রাকালের পক্ষে যথেষ্ট নয়: পরিকল্পনা করা হয়েছিলো যে মেরু পর্যন্ত মৌমাছিরা নিজেদের সঞ্চিত খাদ্য খেয়ে যাবে, আর পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে মধু আহরণের জন্য তাদের হবে ছেড়ে দেওয়া।

আর একটি দিনও নষ্ট করা যায় না। আর প্রত্যেকেই এদিকে বেরিয়েছে ঘাস কাটতে। তুন্দ্রা থেকে আগত এলজা

ম্যানেজারের যে রকম মত পরিবর্তন করিয়েছিলো সে রকম এদের মত পরিবর্তন করার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের সর্বত্র উদার-চেতা ঋষির মতো মানুষের দেখা সব সময়েই পাওয়া যায়। বর্তমানে সে মানুষটি হলেন ইয়াকভ পপোভ, আমার শৈশবের ইভান উস্তিনিচের মতো এক মৌমাছি-রক্ষক।

তোমরা মনে করতে পারো আর বুঝি কোনো কুলাক বেঁচে নেই। কিন্তু কচিত কখনো এমন কি আমাদের সামাজিক ব্যাপারেও সেই প্রাচীন মালিকানার প্রবৃত্তিটা অনুভূত হয়। এমন মানুষ ছিলো যারা নিজেদের জন্য উৎকৃষ্টতর মৌমাছিগুলো রেখে নিকৃষ্টতর মৌমাছিদের মেরুতে পাঠানোর জন্য ছিলো ব্যস্ত। ইয়াকভ পপোভ না থাকলে প্রথম মোহিকানের অবস্থাটা খারাপ হয়ে দাঁড়াতো। তাঁর দায়িত্ব ছিলো বিরাট, সেই এলাকাটা ছিলো ওকার তীর থেকে অনেক দূরে, মেরু অঞ্চলে। কিন্তু উত্তরের বাসিন্দা না হওয়া সত্ত্বেও ইয়াকভ পপোভ যে কোনো লোকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ছিলেন প্রস্তুত যারা কাজ করছিলো 'না ঠকালে বিক্রি করবো না' এই নীতি অনুসারে। কারণ সর্বান্তঃকরণে তিনি ছিলেন সুমেরু অঞ্চলের স্বপক্ষে।

তারপর এলো 'সবুজ রাত', পরে তার এই নামকরণ

করা হয়েছিলো। লরির অভাবের জন্য, আর সম্ভবত রাস্তাটা খারাপ বলে অরণ্য থেকে মৌমাছিগুলোকে মালবাহী গাড়ি করে মাঠের মধ্যে দিয়ে, তারপর ওকার উপর দিয়ে ইস্টিশানে নিয়ে যাবার কথা ছিলো। মৌমাছি বিশারদরা, যাঁরা মৌমাছিদের ধরণ-ধারণ জানেন, অস্ত্রোপচারের আগে ডাক্তারদের মতো হয়ে উঠেছিলেন উৎকণ্ঠিত। যদি একটি মাত্র মৌমাছি কোনো মৌচাক থেকে পালিয়ে কোনো ঘোড়াকে কামড়ায় তা হলে সেই ঘোড়া পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠতে পারে, পারে গাড়ি চরমার করতে। আর একটি মাত্রও চাক যদি ভেঙে যায় তা হলে মাত্র দু'শ মৌমাছি মেরে ফেলতে পারে একটা ঘোড়াকে। অনেকগুলো ঘোড়া ছিলো, প্রত্যেকটার সঙ্গে ছিলো তার বাচ্চা। ইয়াকভ পপোভ তাই সমস্ত রাত ধরে যেতে লাগলেন একটা গাড়ি থেকে আর একটায়, সন্দেহজনক জায়গায় ফুঁ দিয়ে দিতে লাগলেন ধোঁয়া, আর পথের ঝাঁকুনিতে মৌচাকগুলোর যে সব জায়গাগুলো চিড় খেয়েছে কিংবা ফুটো হয়ে গেছে সেগুলোর প্রত্যেকটাকে কাদা দিয়ে বুজিয়ে দেবার জন্য এক বালতি কাদা নিয়ে রোদিওনোভ করতে লাগলেন ছুটোছুটি।

এইভাবে ক্রমাগত খবরদারির মধ্যে সমস্ত রাত ধরে তাঁরা চললেন, আর সমস্ত রাত ধরে একমাত্র ভাবনা রইলো

তাঁদের মনে—যাতে কোনো মৌচাক থেকে একটিও মৌমাছি না পালায় সেটা দেখা। মানুষের মাথায় ভরে রইলো নানা দুর্ভাবনা, কিন্তু বাইরে, গ্রীষ্মের রাত্রে, মাঠে গঙ্গা-ফড়িংদের একমাত্র ভাবনা একটি মাত্র সুর ভাঁজা, এদিকে সমস্ত রাত ধরে পাট্রিজগুলো ডাকতে লাগলো করুণ সুরে আর একটা কর্ণক্রেক চেঁচাতে লাগল: 'কী কষ্ট বাবা, কী কষ্ট মা।'

এ কারণেই পরে রোদিওনোভ এই রাতকে উল্লেখ করেছিলেন তাঁর সবুজ রাত বলে।

কিন্তু ইস্টিশান-মাস্টারের সহানুভূতি দেখে আমরা সবচেয়ে অবাক হলাম—আগের রাত্রে পাঠানো মৌমাছিদের একটা চালান রেল ইস্টিশানে রেখে যাওয়া হয়েছিলো। অবশ্য মৌমাছিদের সঙ্গে ছিলো এক প্রহরী, কিন্তু তার এ রাত্রে পারিবারিক কোনো বিপদ ঘটেছিলো। নিঃসন্দেহে এ কথা ভেবে যে ইস্টিশানে মৌমাছিদের বিশেষ কিছু ঘটতে পারে না, সে পালিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু মৌমাছি-প্রিয় ইস্টিশান-মাস্টার তার স্থান গ্রহণ করে সমস্ত রাত ধরে পাহারা দিয়েছিলেন যতক্ষণ না দ্বিতীয় চালানটা পৌঁছয়। তাঁর কাছেও নিঃসন্দেহে সে রাতটা ছিলো 'সবুজ' রাত।

৭

সুমেরুর মধু আবিষ্কারের জন্য উক্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সমবেত প্রচেষ্টাকে যতই কেন বাহবা দিতে ইচ্ছে করুক না, মৌমাছি-বিশারদের কাজকে কখনো তারিফ করা যায় না যতক্ষণ না হৃদয়ঙ্গম করা যায় মৌমাছিরা কী রকম কোমল আর সংবেদনশীল জীব। কোনো অভিজ্ঞ মৌমাছি-পালকের সঙ্গে কিছু কথা বললেই নিজেকে তুমি প্রশ্ন করবে: এই মৌমাছি-প্রিয় লোকটা কি বাড়িয়ে বলছে না?

ইয়াকভ পপোভ আমাদের বলেছিলেন যে, বহু বছর আগে সূর্যগ্রহণের ঠিক আগে সকাল থেকে যথারীতি মৌমাছিগুলো ওকা পেরিয়ে মাঠে গিয়েছিলো উড়ে, কিন্তু লোকেরা গ্রহণ দেখবার কয়েক ঘণ্টা আগে মৌমাছিগুলো একটা বিরাট ধূসর চুঙ্গির আকারে উড়ে ফিরে এসে তাদের মৌচাকগুলোর চারপাশে বসেছিলো জমাট বেঁধে। গ্রহণ যখন শুরু হোলো প্রত্যেকে এ কথা ভেবে অবাক হয়েছিলো যে মৌমাছিরা কী করে সে কথা জানতে পেরেছিলো আগে থেকে।

কিন্তু কুকুরদের যদি বিশেষ ক্ষমতা থাকে বহু মাইল দূরে অরণ্যের মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া প্রভুকে

আবিষ্কার করার বৃষ্টিতে তার পদ-চিহ্ন ধুয়ে যাবার পরেও, আর আমরা সমুদ্রের উপর দিয়ে যে-ভাবে যেতে পারি তার চেয়েও ভালো আর নির্ভুলভাবে পাখীরা যদি আকাশে পারে উড়তে তা হলে আকাশে সূর্যের অবস্থান সম্বন্ধে মৌমাছিদেরই বা কেন বিশেষ ধরনের জ্ঞান থাকবে না?

বহুকাল ধরে মৌমাছিদের নাচকে মনে করা হোতো মৌমাছি-পালকদের বানানো রূপকথা বলে, কিন্তু বিজ্ঞান এখন প্রমাণ করেছে যে উক্ত নাচটা মৌমাছিদের ভাষা, অনুসন্ধানী মৌমাছি আর কর্মী মৌমাছিদের মধ্যে মনোভাব প্রকাশ করার একটা উপায়, মধু-ভরা ফুলের অবস্থান সম্পর্কে তিনটি বিষয়ের বর্ণনা: মৌচাক, ফুল আর সূর্যের অবস্থান। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে দুটি হোলো স্থায়ী, আর তৃতীয়টির — সূর্যের অবস্থানের — ঘটে পরিবর্তন। অনুসন্ধানকারীরা যে কাহিনীটা বলে সেটা আসলে সেই মুহূর্তে মধু-ভরা ফুলের ক্ষেত্রের উপর সূর্যের রশ্মি যে কোণ রচনা করেছে তার বর্ণনা।

বেশ কথা — যেহেতু অনুসন্ধানকারী মৌমাছিরা নিজেদের উপায়ে যদি সূর্যের অবস্থানের কথাটা জানাতে পারে তা হলে এই একই স্থানবিবরণে নিপুণ মৌমাছিরা কেন গ্রহণের ঠিক আগেই সূর্যের অবস্থার খবর আনবে না আর ‘পৃথিবীর

ধ্বংসের' কথা ভেবে কেন সব মৌমাছিরা ভয় পেয়ে তাদের চাকের কাছে ঝাঁক বেঁধে আসবে না আশ্রয়ের জন্য?

এই ব্যাপারের মধ্যে আজগুবি কিছু নেই। কিন্তু মৌমাছিরা কী রকম সংবেদনশীল জীব সে কথা জানার পর তাদের মেরুতে নিয়ে যাবার বিপদের কথা ভেবে কে না কেঁপে উঠবে?

দেশের প্রয়োজনের জরুরি আর জটিল অবস্থার কথা বিবেচনা করলে বোঝা যাবে যে মেরু অঞ্চলে মৌমাছিদের পাঠানোর জন্য একটি রেফ্রিজারেটার-ভ্যান জোগাড় করা এবং সেটিকে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের নির্ঘণ্টের অন্তর্গত করাটা সহজ হয়নি। আর সেই সব ব্যবস্থা স্থির হবার পর কর্মীদের খোঁজা কিংবা মত পরিবর্তন করার সময় থাকে না—তোমাকে যেতেই হবে, এমন কি তুমি যদি মৌমাছিদের একমাত্র প্রহরী হও তা সত্ত্বেও—কাজে হাত দিলে পিছ-পা হওয়া যায় না।

'কিন্তু একেবারে একলা কী করে তুমি সব সামলাতে পারবে?' মালগাড়ির মধ্যে চাকগুলোকে উপর-উপর করে সাজাতে সাহায্য করার ফাঁকে ফাঁকে ইয়াকভ পপোভ ক্রমাগত প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন।

'আমাকে যেতেই হবে', রোদিওনোভের মুখে একমাত্র উত্তর।

মৌমাছিদের প্রচুর বাচ্চা ছিলো। তার মানে পথে বড়দের সঙ্গে ছোটোরাও সঞ্চিত খাদ্যে ভাগ বসাবে! ট্রেনটা যেতে যদি দেরী করে তাহলে বাচ্চারা সঞ্চিত খাদ্য নিঃশেষ করবে আর মৌমাছিগুলো মারা যাবে অনাহারে।

'কিন্তু তুমি সামলাবে কী করে?' ইয়াকভ পপোভের স্বরে অপ্রস্তুতের ভাবটা ক্রমশ উঠলো বেড়ে।

তাঁর উৎকণ্ঠার কারণ রোদিওনোভ সম্পূর্ণ বুঝলেন। এই বৃদ্ধ ভেবেছিলেন তাঁর কর্তব্য নিজের সত্তর বছর বয়সের ভারটাকে, তাঁর অসংখ্য পারিবারিক ও যৌথখামারের কাজকে উপেক্ষা করে রোদিওনোভের সঙ্গে যাওয়া।

তিনি জোর দিয়ে বললেন, 'নিরস্ত হও, বন্ধু! তুমি তো জানো এটা তামাসার ব্যাপার নয়!'

কিন্তু নিরস্ত হওয়া মানে পরের বছরের আগে যাবার সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দেওয়া। মালগাড়িটাকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর একটা জোগাড় করা খুব সহজ হবে না, আর তারপর আবহাওয়া যাবে বদলে, চিনি হবে জোগাড় করতে...

মৌমাছিদের দেখাশোনা করার তাড়ায় বৈজ্ঞানিক নিজের প্রয়োজনের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেন। তাঁর এক মৌমাছি-প্রিয় বন্ধুকে টেলিগ্রাম পাঠাতে হোলো, তাঁকে অনুরোধ

করতে হোলো কিছু রুটি আর প্রয়োজনীয় জিনিস স্যুটকেসে ভরে ট্রেনে নিয়ে আসতে।

ইভান ভ্জোরোদোভ যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। তাঁর চেহারার মধ্যে কোনো রকম বৈশিষ্ট্য ছিলো না। ট্রেন ছাড়ার ঠিক আধ-ঘণ্টা আগে স্যুটকেস নিয়ে তিনি পৌঁছলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চাকগুলোর সেই সব ফাঁকে ফাঁকে তিনি খড় ভরতে শুরু করে দিলেন যেগুলো ঘষা লাগতে পারে। মনে হোলো এক দৃষ্টিতেই তিনি তাঁর বন্ধুর সঙ্কটাবস্থার কথা বুঝতে পেরেছেন। কারণ সাবধানসূচক ঘণ্টাধ্বনিতে তিনি একেবারেই কান দিলেন না। কাউকে কিছু না বলেই সুমেরু অঞ্চলে দ্রুত বেগে তিনি যাত্রা করলেন।

৮

এমন বিপদসঙ্কুল দিন আসে সবকিছুই তখন আত্ম-প্রকাশ করে দু' রকম আলোয়: একটা পথ যদি অনুসরণ করো তা হলে পড়বে খুব অসুবিধেয়; অন্য পথ যদি অনুসরণ করো তা হলে প্রথম দিকে সবকিছুই হবে সহজ আর আরামজনক, কিন্তু শেষকালে অনিবার্যভাবে পড়বে নেকড়ের মুখে।

এইভাবে আমাদের মৌমাছি-বিশারদ বন্ধুদের পথ দ্বিধা-বিভক্ত হোলো — বলা কঠিন হোলো কোন পথটা কঠিন

আর কোন পথটা নিয়ে যাবে নেকড়েদের কাছে। মৌমাছিদের প্যাক করার সময় চাকের উপরকার ফ্রেমগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছিলো যাতে মৌমাছিরা ঝাঁক বেঁধে বসার জায়গা পায়। উপরের দিকে পেরেক দিয়ে তারের জাল আটকে দেওয়া হয়েছিলো যাতে তারা পালাতে না পারে। হাতুড়ির প্রথম বাড়ির শব্দে মৌমাছিরা উত্তেজিত হয়ে উঠলো, কিন্তু ট্রেন পূর্ণ গতিতে চলার সময় তারা যে রকম বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো তার তুলনায় সেটা কিছু নয়।

রেফ্রিজারেটার-ভ্যানের ছাত থেকে অসংখ্য মাংস ঝোলাবার হুক দুলতে লাগলো, তাদের ছ'টির সঙ্গে মধু নিষ্কাষক যন্ত্রকে হয়েছিলো আটকে দেওয়া। ট্রেন যখন চলতে লাগলো তখন এই যন্ত্রগুলো আঘাত করতে লাগলো পরস্পরকে, মৌমাছিদের উপর ঝনঝন করতে লাগলো ঘণ্টার মতো। তাদের অসুবিধের আর একটা কারণ ভ্যানের মধ্যে বোঝার স্বল্পতা। তাক-যুক্ত এক শ'টি মৌচাক ও মধু নিষ্কাষক যন্ত্র সেখানে ছিলো, তা ছাড়া উত্তর অঞ্চলে মৌমাছি পালনের জন্য ছিলো নানা ধরনের যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম। মালগাড়িটা এতো ভর্তি ছিলো যে এই দু'জন যাত্রীর জন্য জায়গা বলতে গেলে ছিলোই না। কিন্তু সাধারণ বোঝার

তুলনায় তার ওজন কিছুই নয়। মৌমাছিগুলো যাচ্ছিলো এক্সপ্রেস ট্রেনে, তাই তাদের খুব ঝাঁকুনি লাগছিল।

পথে অল্পক্ষণের মধ্যেই স্পষ্ট বোঝা গেলো যে মৌমাছিরা প্রচুর খাদ্য গ্রহণ করেছে আর উত্তেজিত হয়ে ক্রমশ ঝাঁক বেঁধে বসছে ঘনীভূতভাবে। ফলে তাপমাত্রা উঠছে বেড়ে। বরফ ক্রমাগত গলে যেতে লাগলো। কিছুক্ষণ ছাড়া ছাড়া নতুন বরফ দিয়ে পূরণ করে দেওয়া দরকার হয়ে উঠলো। কিন্তু এর জন্য প্রথম প্রচেষ্টাতেই আবিষ্কৃত হোলো যে প্যাসেঞ্জার ট্রেন ইস্টিশানে যে অল্প সময়ের জন্য থামে তাতে মালগাড়িটাকে বরফ দিয়ে ভরে তোলা অসম্ভব। মালগাড়িটাকে খুলে ফেলতে হোলো, পরের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে নষ্ট হোলো একটি দিন আর রাত।

এখন মৌমাছি-পালকরা পড়লেন ঠিক সেই অবস্থার মধ্যে যার বর্ণনা গোড়া থেকে আমি করে এসেছি—তুন্দ্রার ফুলের দিকে যাবার উত্তরের পথটি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে চলে গেছে দু'টি দিকে: যাত্রার সময় বরফ ব্যবহার করার অর্থ যাত্রাকালকে দীর্ঘতর করা, সেই সময়ে সঞ্চিত খাদ্য যাবে নিঃশেষ হয়ে আর মৌমাছিরা মরবে অনাহারে; বরফ ব্যবহার না করার অর্থ তারা তাপমাত্রাকে ভয়ঙ্কর বাড়িয়ে তুলবে আর দমবন্ধ হয়ে মরবে তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে।

কিন্তু মনে হয় কোনো নতুন ধরনের কাজে নামলে সৃজনশীল কাজের কোনো না কোনো অবস্থায় পথটা যাবে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে, সাহায্য করার জন্য কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। অভূতপূর্ব জীবন তখন আত্ম-প্রকাশ করে।

এমন কি এখনই, যখন আমি এই সম্পূর্ণ সত্য গল্প বলতে মত্ত, আমার নিজের পথটাও দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। সত্যনিষ্ঠভাবে গল্প বলার কঠিন পথ ছেড়ে আমি লুব্ধ হচ্ছি সে জায়গায় গল্পটিকে নিয়ে যেতে যেখানে এক ভালো পরী সাহায্য করে ঠিক সময়ে...

এমন কোনো উদাহরণ ছিলো না মৌমাছি-বিশারদরা যার কথা স্মরণ করতে পারেন—সম্ভবত অতগুলো মৌমাছিকে ইতিপূর্বে কখনো ট্রেনে করে সুদূর উত্তরে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

কিন্তু সৌভাগ্য বলে হয়তো কোনো জিনিস থাকতে পারে, আর সেই সৌভাগ্যের খানিকটা আমাদের মৌমাছি-বিশারদরাও পারে না কি লাভ করতে?

রোদিওনোভ বললেন, 'ইভান, পরের যে ইস্টিশানে বরফ পাওয়া যাবে সেখানে না থামার ঝুঁকি নেওয়া যাক।'

ইভান বললেন, 'প্রথমে দেখা যাক তাপমাত্রা কত।'

মেঝের তাপ শূন্য'র ৯ সেণ্টিগ্রেডের উপরে, অর্থাৎ

স্বাভাবিক, আর উপরকার তাপ — ১৮, সেটাও খুব ভয়ের কিছু নয়।

রোদিওনোভ বললেন, 'এই ঝুঁকিটা কি আমরা নোবো?'

'কোস্তিয়া খুড়ো, ঝুঁকিটা আমরা নোবো', ইভান বললেন।

মৌমাছি-বিশারদরা ঝুঁকিটা নিলেন, যে ইস্টিশানে বরফ পাওয়া যায় সেখানে তাঁরা থামলেন না।

আর অল্পক্ষণের মধ্যেই — কী করে যে সেটা ঘটলো সে কথা কেউ একেবারেই ব্যাখ্যা করতে পারবে না — মনে হচ্ছে শেষ বরফটা গলে গেলো, আর চাকের ভিতরকার তাপমাত্রা বেড়ে উঠতে লাগলো মারাত্মকভাবে।

তাঁদের অবস্থাটা ছিলো সেই রকম যখন ডুবন্ত লোকেরা খড়কেও চায় মুঠো করে ধরতে। সেখানে এমন কি ধরার মতো কোনো খড়ও ছিলো না।

নীচের চাকে তাপমাত্রাটা মৌমাছিদের পক্ষে খুব খারাপ ছিলো না, কিন্তু মানুষের পক্ষে সেটা ছিলো খুব ঠাণ্ডা আর নিরানন্দ। তাঁদের পায়ের নীচে মেঝেটা ক্রমাগত নাচতে লাগলো, শোবার কিংবা গায়ে ঢাকা দেবার মতো কোনো কিছুই নেই আর চরম হোলো — জায়গাটা অন্ধকার। চাকগুলোর মাঝে তাঁরা গুঁড়ি মেরে বসলেন এক জোড়া ফিঞ্চের মতো, যারা ঝোপের মধ্যে ঝড়-বৃষ্টি থেকে আশ্রয় নিয়েছে। তাঁদের

হাতগুলো যখন গরম হয়ে উঠলো মৌমাছিদের জন্য ভয়ে তাঁদের বুকগুলো হয়ে গেলো হিম।

'ইভান, মনে হচ্ছে এটা গরম হয়ে উঠছে, থার্মোমিটারটা নাও, এই নাও মোমবাতির অবশিষ্ট টুকরোটা, ওপরে চড়ে পড়ো।'

ইভান উত্তর দিলো, 'কোস্তিয়া খুড়ো, তাড়া কোরো না। আমরা খানিক আগে দেখেছি। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক।'

কিন্তু তাঁরা ঘুমিয়ে পড়তে না পড়তে আর একটা নতুন বিপদ-সঙ্কেত এলো। হয় তাপ, কিংবা অন্য কোনো কারণে, কিংবা সবকিছুর জন্য কয়েকটা অবাধ্য মৌমাছি চাক থেকে বেরুবার পথ খুঁজতে লাগলো। স্বভাবতই মালগাড়ির ঝাঁকানির দরুণ চাকগুলোর কয়েকটা কাদা-ভরা ফাটল খুলে গিয়েছিলো আর অস্থির ভ্রাম্যমাণ মৌমাছিগুলো সেগুলোর ভিতর দিয়ে পেয়েছিলো বেরুবার পথ। অন্ধকারে তারা উড়তে পারেনি, তারা শুধু উপরকার চাক বেয়ে নীচের চাকগুলোর উপর দিয়ে এসে পৌঁচেছিলো মেঝেয়।

'উড়ন্ত মৌমাছির চেয়ে হেঁটে বেড়ানো মৌমাছির হুল ফোটানোটা অন্য ধরনের: সে সময় কম তীব্র হলেও সেটা বেশী যন্ত্রণাদায়ক।'

এ কথাগুলো রোদিওনোভ আমাদের পরে বলেছিলেন। আমি এখনো জানি না এ কথাগুলো সত্যি নাকি এগুলো শুধু তাঁদের মনে হয়েছিলো ঠাণ্ডা, অন্ধকার মালগাড়িটার মধ্যে।

কিন্তু যে কেউ কোনো বৈজ্ঞানিক অভিযান অথবা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গিয়েছিলো — আজকের দিনে এমন কেই বা আছে যে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যায়নি — সেই জানে যে এসব ব্যাপার একেবারেই তুচ্ছ, ঘটনা-প্রবাহে তাদের কোনো স্থান নেই। একমাত্র কষ্টকর এই যে যখনই কোনো হেঁটে-আসা মৌমাছি তাঁদের হুল ফোটাচ্ছিলো, তাঁদের দায়িত্বের চিন্তাগুলোও হুল ফোটাচ্ছিলো তাঁদের আরো জোরে আর যন্ত্রণাদায়কভাবে।

তাঁরা যে মৌমাছিগুলোর জন্য দায়ী সেটাই যে সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার তা নয়, সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার তাঁরা যাই করুন না কেন মনে হোলো না তাতে কোনো উপকার হচ্ছে। সবকিছুই মনে হোলো ভুল হচ্ছে বলে।

'না ইভান, আমি ঘুমতে পারছি না। একবার ওপরে ওঠার চেষ্টা আমি করবো।'

'কোস্তিয়া খুড়ো, আমিও ঘুমতে পারছি না — ওই মোমবাতির শেষ অংশটা নেওয়া যাক।'

মোমবাতির শেষ অংশটা হাতে করে ইভান থার্মোমিটার নিয়ে এক চাক থেকে আর এক চাকে উঠতে লাগলেন।

তৃতীয় সারির উপরে দাঁড়িয়ে থার্মোমিটার হাতে নিয়ে নির্দ্ধারিত মিনিট ধরে তিনি অপেক্ষা করছিলেন আর সেটাকে আনছিলেন নিজের চোখের কাছে... এমন সময় অকস্যাৎ মোমবাতিটা গেলো নিভে। ইভান ভারসাম্য হারিয়ে চাকগুলোর উপর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, থার্মোমিটারটা তাঁর হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেলো।

থার্মোমিটারটাকে আবিষ্কার করা সহজ হোলো না। কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে খুঁজতে লাগলেন, হেঁটে-বেড়ানো মৌমাছিগুলোর উপর তাঁদের হাত পড়তে লাগলো, যন্ত্রণায় তাঁরা চীৎকার করে উঠতে লাগলেন আর লাগলেন গালাগালি করতে। অবশেষে পেলেন তাঁরা সেটা খুঁজে।

'ওতে কত উঠেছিলো, ইভান?'

'কোস্তিয়া খুড়ো, আপনাকে বলতে আমার সাহস হচ্ছে না। উঠেছিলো শূন্য'র ২২ ডিগ্রি ওপরে। আমাদের দফা শেষ!'

'আমাদেরই দোষ—বরফ না নিয়ে যাত্রা করা উচিত হয়নি।'

'কিন্তু যদি আমাদের গাড়িটাকে আবার খুলে দেওয়া হোতো তা হলে আরো দুয়েকটা দিন যে নষ্ট হোতো।'

তা হলেই দেখতে পাচ্ছো। নতুন আর অজানা পথ ধরে যখন তুমি প্রথম এগিয়ে যাও, যে পথে তোমার আগে কেউ

কখনো যায়নি, সে পথটা অনিবার্যভাবে দ্বিধা-বিভক্ত হবেই। আর এই মুহূর্তে আমরা কি সত্যের পথটা ত্যাগ করবো? আমরা কি উত্তরে মধু আবিষ্কারের গল্পটাকে একটা রূপকথা করে তুলবো আর সেটার উদ্ধারের ব্যাপারটাকে ছেড়ে দেবো কোনো ভালো পরীর হাতে?

না! তার কারণটা এই: পৃথিবীতে কবির সংখ্যা বেশী নয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রায় সব মানুষই কবি। যদি তাই হয় তা হলে ঠিক যেমন নিজের বাড়ির মধ্যে তেমনি জীবনের মধ্যেও কবিতা আছে, আর যে কেউ জীবনকে ভালোবাসে তাকেই সে রূপান্তরিত করতে পারে ভালো পরীতে। জীবনকে বিশ্বাস করা যাক, সত্যের পথ ধরে যাওয়া যাক।

হতভাগ্য মৌমাছি-বিশারদরা চাকগুলোর মধ্যে বসেছিলেন একেবারেই আনন্দিত চিত্তে নয়, কিন্তু কিছুতেই তাঁরা দমলেন না। আর আমরাও, তাঁদের অবস্থা বুঝতে পেরে নিশ্চয়ই দমবো না। যা কিছু সম্ভব তাঁরা করেছেন, তাঁদের শুধু জানা দরকার যে নতুনের পথটা বিপদ-শূন্য নয়। আর এতোক্ষণ ধরে ট্রেনটা সমানে চলেছে। অল্পক্ষণ ছাড়া ছাড়া মৌমাছি প্রহরীরা পাকানো ছেঁড়া কাপড় জলে ভিজিয়ে চাকগুলোর উপরকার তারের জালের উপর গুঁজে দিচ্ছিলেন

যাতে উত্তাপের জন্য যে তৃষ্ণা নিশ্চয়ই উদ্রিক্ত হবে সেটা মৌমাছিরা মেটাতে পারে। বহুক্ষণ লাগলো সেই এক শ'টি ঝাঁকের চলমান মৌমাছিদের প্রত্যেককে একবার করে জল পান করাতে। আর ট্রেনটা ক্রমাগত চলতে লাগলো, একের পর এক ইস্টিশানগুলো লাগলো পাশ দিয়ে দ্রুত সরে যেতে। অকস্মাৎ এক ইস্টিশানে দরজায় টোকা পড়লো...

এখন আমাদের হৃদয় উৎফুল্ল হতে পারে: আমরা ঠিক পথ ধরেছি। স্পেনের বিপ্লবের বছর আমাদের দেশে বহু অনাথ এসেছিলো—স্পেনের ছেলেমেয়েরা। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিলো, পাকিতা। তার বাবা যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো, তার কাছে মা ছিলো না। তাই সে বড় হয়ে উঠেছিলো আমাদের তুষারের মধ্যে, আমাদের খাবার খেয়ে, পেয়েছিলো আমাদের শিক্ষা। সেই স্পেনের মেয়েটির ভাগ্য ছিলো অদ্ভুত—তার দেহে দক্ষিণের উষ্ণ রক্ত, অথচ সে হয়ে উঠেছিলো এক রেফ্রিজারেটার কারখানার ম্যানেজার। আর সেই প্যাকিতাই, কালো কোঁকড়া চুলের উপর তার আপিসের লাল টুপি পরে, প্রবেশ করলো মালগাড়ির মধ্যে।

অবশ্যই আমাদের দেশে যত দয়ালু আর বুদ্ধিমতী মেয়ে আছে স্পেনেও আছে তত, কিন্তু কেমন করে যেন শুধু ভালোমানুষ রুশী মেয়ের চেয়ে কমলালেবু, আনারস, অলিভ

তেল, সেরেনাদ-সঙ্গীত, গুয়াদালকুইভির নদীর পটভূমির টুপি-পরা রেফ্রিজারেটার কারখানার ম্যানেজার স্পেনের মেয়েটিকে যেন ভালো পরীর বেশী কাছাকাছি বলে মনে হয়। প্রকৃত মেয়ের সহজাত মাতৃত্ব-বোধ দিয়ে সে চট করে সঙ্কটাবস্থা বুঝতে পেরে মৌমাছি-বিশারদদের পক্ষ আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়ে যতক্ষণ মালগাড়িতে বরফ ভরা হচ্ছিলো ততক্ষণ ট্রেনকে থামাতে তাঁদের সে সাহায্য করলো আর ভাঙা থার্মোমিটারের বদলে দিলো আর একটা এনে। তাদের বিছানার জন্য নিজে হাতে নিয়ে এলো সে খড, এমন কি তাদের চা আর জ্যাম খাওয়াবারও সময় সে পেলো।

বন্ধু, পাকিতার দিকে তাকাও! কোনো পরীর চেহারা কি তার চেয়ে মিষ্টি হতে পারে? আর আনন্দ কর: আমরা ঠিক পথ বেছে নিয়েছি, নেকড়েরা আমাদের খেতে পারবে না।

৯

উত্তরে, সুমেরু-বৃত্তের ওপাশে, মাঝেমাঝে পাহাড়-প্রমাণ ফুল ফুটে ওঠে: সেই পাহাড়গুলোর রঙ শাদা হলে বোঝা যায় মেঘবেরি আর বিলবেরি ফুটেছে। মাঝে মাঝে জুলাইতে তুমি দেখতে পাবে একটা পাটল বর্ণের পাহাড়—তার মানে উইলো-গুল্ম ফুটতে শুরু করেছে, কিংবা

রোজমেরি, কিংবা জেরানিয়াম, কিংবা ঈশ্বরই জানেন কী। আর ভাবো একবার আমাদের অঞ্চলের ফুলের চেয়ে সেখানকার প্রতিটি ফুলের মধ্যে আছে দু'গুণ কি তিন গুণ বেশী মধু, আর প্রত্যেক ফুল অপেক্ষা করে রয়েছে এক মৌমাছির জন্য, আর মেরু বৃত্তের ওপারে একটিও মৌমাছি নেই।

আমার মনে পড়ে যৌবনে যখন বৃষ্টি পড়তো না তখন আমি এই উত্তরের ফুলগুলির ভিতর দিয়ে দিনের পর দিন হেঁটে বেড়াতাম। আমার জামাকাপড় যেতো ভিজে, শিশিরে নয়, মধুতে। তবুও কোলা উপদ্বীপের প্রকৃতি মানুষের কাছ থেকে কী চায় সে কথা অনুমান করার জন্য তখন আমি যথেষ্ট ভাবতে পারিনি, জীবনের উপর পারিনি খুব মনোযোগ দিতে।

আমাদের সুমেরুর মধু আবিষ্কার করার নানা চিত্তাকর্ষক বিষয়ের অন্যতম এই যে প্রকৃতির ক্ষতি করে সেই মধুকে তৈরী করা হয়নি, লক্ষ-লক্ষ টন মধু ফুলের মধ্যে লুকিয়েছিলো পরাগযোগ করার জন্য মৌমাছিদের আকর্ষণ করতে, এবং আমরা আমদানি না করা পর্যন্ত সেখানে কোনো মৌমাছি ছিলো না।

ফুলেরা অপেক্ষা করেছিলো মৌমাছিদের জন্য, তার অর্থ সূর্যও অপেক্ষা করেছিলো তাদের জন্য, কারণ

ফুলেদের সঙ্গে নিজেদের আমরা যদি এক করে ফেলতে পারি তা হলে এ কথা বলতে আমাদের বাধা কী যে আমাদের প্রাণদায়ক সূর্যেরও প্রয়োজন ছিলো মৌমাছিদের? সূর্য, ফুল, মানুষ—সবাই অপেক্ষা করে ছিলো।

পৃথিবীতে এমন জিনিস আছে যার মূল্য সর্বপ্রধান, এমন জিনিস সবাই যেটাকে বোঝে, তাদের মধ্যে প্রকৃতি ও মানুষের সন্ধি ঘটায় এক প্রাচীন বন্ধনে, আর সে ধরনের প্রথম জিনিসগুলির অন্যতম — রুটি। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুধার্ত না হলে তুমি রুটির মধ্যে সূর্যালোককে অনুভব করতে পারবে না, মধুর মধ্যে সেটা অনুভব করা অনেক সহজ। এ কারণেই যে জনতা আপাতিতি (খিবিনি) ইস্টিশানে মৌমাছিদের জন্য অপেক্ষা করছিলো তারা অত আনন্দিত হয়ে উঠেছিলো।

এমন কি রেফ্রিজারেটার-ভ্যানের দরজাটা যখন খুলে দেওয়া হোলো আর যে মৌমাছিগুলো হেঁটে বেড়াচ্ছিলো সেগুলো যখন আলোয় আকৃষ্ট হয়ে বাইরে উড়ে সবাইকে হুল ফোটাতে শুরু করলো—কারুর গালে অথবা নাকে, কারুর ডান বা বাঁ পাশে, কারুর শার্টের উপর দিয়ে, কারুর শার্টের ভিতরে গিয়ে—লোকেরা তখন শুধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসিতে পড়লো ফেটে।

এই সহজভাবে আর প্রফুল্লতার মধ্যে মৌমাছিরা সুমেরু অঞ্চলে শুরু করলো তাদের জীবন।

অর্দ্ধেকেরও বেশী ঝাঁকের মৌমাছিরা রইলো খিবিনিতে। সঙ্গে সঙ্গে লরি করে সুশিক্ষিত মৌমাছি-বিশারদদের তত্ত্বাবধানে তাদের দ্রুত নিয়ে যাওয়া হোলো 'ইওাস্ট্রিয়া' রাষ্ট্রীয় খামার, বোটানিক্যাল গার্ডেন আর মঞ্চেগোরস্কে।

প্রত্যেক নতুন কাজেই যেমন ভুল হয়ে থাকে এখানেও তেমনি নানা ভুল করে ফেলা হোলো—যদি তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় পোঁছয় তা হলে মৌমাছিদের জন্য চিনি আনাবার কথাটা কেউ আগে থেকে ভেবে দেখেনি। তাই স্বাগত জানাবার প্রথম আনন্দোচ্ছাসের পরেই দেখা দিলো আতঙ্ক।

এটা বিশেষ কারুরই দোষ নয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে সূর্যের যেমন দিকচক্রবালের নীচে অস্ত যাওয়া উচিত উত্তরে সূর্য সে রকম ডোবে না। আর যখন কিছু ভুল হয়ে যায় লোকেরা মনে করে যে ইচ্ছে করেই সূর্য আকাশে থামে তাদের ভুল প্রকাশ করার জন্য, তিরস্কারের দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে, প্রশ্ন করে:

'কেন ও কথাটা তোমরা ভাবোনি?'

সেখানে প্রকৃতির হাবভাবে তোমাকে অভ্যস্ত হতে হবে

যাতে তোমার গোপনীয় জীবনের মধ্যরাত্রির সেই সাক্ষীর পলকহীন চোখ তোমাকে জাগিয়ে না রাখে।

আর মেরু এইসব রৌদ্রজ্জ্বল রাত্রে কী অসাধারণই না স্তব্ধ! পুষ্পিত বিলবেরির বৃন্তের মধ্যে দিয়ে গুবরে পোকার যাবার শব্দও তুমি পাবে শুনতে। এমন নিস্তব্ধ যে গাছের মগডালে বন্য-কুক্কুটের নাক ডাকার শব্দও তুমি পাবে শুনতে।

মধ্যরাত্রির সূর্যের অবিরাম আলোর ভিতর দিয়ে এই সব রাত্রে সময় বয়ে যায় অলক্ষিতভাবে। এই সব রাত্রির কথা বলা আর নিজের কথা বলা একই জিনিস, কারণ প্রত্যেকেই বোঝে নিজের ধরনে। সবাই জেগে ওঠে রোদের কম্পনে, তখন তাপমাত্রা যায় সামান্য কমে, তারপর জেগে ওঠে সুমেরুর পাট্রিজরা জোরে চীৎকার করতে করতে, এবং যেন সংকেত পেয়ে সবাই শুরু করে হাত-মুখ ধুতে, সবকিছু সুরু করে জ্বলজ্বল করতে।

সুমেরুতে এই মৌমাছিদের প্রথম রাত্রিটা ছিলো আশ্চর্য নিস্তব্ধ, উজ্জ্বল আর উষ্ণ। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত মৌমাছিরা নিশ্চয় ভালো করে ঘুমিয়েছিলো, তাদের গুঞ্জন যাচ্ছিলো শোনা। কিন্তু সে রাত্রেও মক্ষিরানী পেড়েছিলো ডিম।

সূর্যের সকালের আলোর প্রথম রশ্মির স্পর্শ পেয়ে মৌমাছিরা জেগে উঠলো আর যথারীতি পাঠালো তাদের চরদের। ঠিক

তখনই তুন্দ্রায় ফুটতে সুরু করেছিল অসংখ্য বিলবেরি, মেঘবেরি, বুনো মটর, রোজমেরি, আর উইলো-গুল্ম। চর'রা বেশীক্ষণ বাইরে রইলো না, তারা ফিরলো তাদের নাচের ভাষায় এদেশের বিবরণ দিতে—কী কী ফুল ফুটেছে, কোন-গুলো কাছে, কোনগুলো আরো দূরে, যাবার পক্ষে কোন জায়গাটা সবচেয়ে ভালো আর জানালো কাদেরই বা হবে উড়তে। এরপর কর্মী মৌমাছিরা ছুটলো মধু সংগ্রহ করতে, আর মক্ষিরাণী চললো ক্রমাগত ডিম পেড়ে।

সেই প্রথম দিনেই ক্লান্ত, জীর্ণ, ক্ষুধার্ত মৌমাছিরা প্রতি ঝাঁক পিছু গড়পড়তায় দু'কিলোগ্রাম করে মধু সংগ্রহ করলো, কয়েকটি ঝাঁক নিজেদের এমন শক্তিশালী বলে প্রতিপন্ন করলো যে তারা প্রত্যেকে নিয়ে এলো চার কিলোগ্রাম করে।

পরের দিনেও অবশ্যই সমস্ত রাত ধরে মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখবার জন্য সূর্য রইলো। মৌমাছি-পালকরা কিন্তু তখন খুসি। প্রহরীকে তারা গ্রাহ্য করলো না। তারা ঘুমলো।

মধুমক্ষিকালয়ে লিখে রাখা হয়েছিলো যে প্রথম দিন মৌমাছিরা কাজ করেছিলো মাঝ রাত পর্যন্ত, রাত দেড়টায় তারা ঘুমিয়েছিলো, পরের দিন তারা ঘুমিয়েছিলো মাঝ রাতের আগে, উঠেছিলো ভোর চারটেয়, আর তৃতীয় দিনে তারা কাজ করেছিলো সকাল আটটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত।

১০

কোলা নদীর কাছে 'সুমেরু' নামে রাষ্ট্রীয় খামারে রোদিওনোভ দ্বিতীয় মৌমাছির চালানটা এনেছিলেন। আপাতিতিতে যে মৌমাছিদের রেখে আসা হয়েছিলো তাদের কপালে যে কী ঘটেছে সে কথা তিনি কিছুই জানতেন না। তিনি শুধু দেখেছিলেন কোলার তীরে মৌমাছিদের সুমেরু অঞ্চলে প্রথমবার চাক থেকে মাঠে উড়ে যেতে। চাকের যাতায়াতের পথগুলো তিনি খুলেছিলেন খানিকটা উত্তেজিতভাবে। মৌমাছিগুলোকে প্রথমে চাকের উপর ঘুরে ঘুরে উড়তে ও পরে আকাশে অনেক উঁচুতে অদৃশ্য হতে দেখে তিনি আরো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি ছেলে চীৎকার করতে করতে ছুটে এলো:

'শীগ্‌গির আসুন। শীগ্‌গির আসুন। মৌমাছিগুলোকে দেখুন!'

রোদিওনোভের হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে যেতে যেতে সে বলতে লাগলো:

'কাকা, কাকা, ওরা সবাই পড়ে গেছে।'

দারুণ আতঙ্কিত হয়ে মৌমাছি-বিশারদ ছেলেটির পিছন পিছন চললেন, বারবার তাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন: 'কোথায় তারা পড়েছে?'

ছেলেটি উত্তর দিলো :

'কাকা, ওরা নদীতে পড়েছে, নদীতে পড়েছে।'

কোলার তীরে তাঁরা দৌড়ে যাবার পর ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলো। কোলার তীরের এই জায়গাটা বালি-ঢাকা চওড়া এক চর। এই চর পর্যন্ত জল আসে, কখনো সে জায়গা থেকে সম্পূর্ণ সরে যায় না। গর্তগুলোয় সব সময়েই জল থাকে, চরের বন্ধুর উপরিভাগটাকে দেখায় হাজার হাজার ছোটো ছোটো পেয়ালার মতো। প্রত্যেকটি পেয়ালার কানায় ঘন হয়ে বসেছে মৌমাছিরা, দীর্ঘ ভ্রমণের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে সুমেরু জল আকণ্ঠ পান করে।

এ রকম দৃশ্য দেখে কে না খুসি হয়ে ওঠে?

এই জল-পানের জায়গায় খানিক বিশ্রাম করে মৌমাছিরা চর ছেড়ে নদীর উপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

মধু সংগ্রহের এটা প্রচলিত পদ্ধতি নয়। কিন্তু সে কথা তখন ভাববার সময় নেই। নদীর ওপারের পথে বেশ বড় এক গোছা মধু-ভরা ফুল নিয়ে দেখা দিলেন একটি মেয়ে। রোদিওনোভ তাঁকে তুন্দ্রার এলজা বলে চিনতে পারলেন, যিনি অমন দক্ষতার সঙ্গে ওকা জেলা কৃষি বিভাগের ম্যানেজারকে তাঁর মৌমাছি বিক্রী করতে রাজী করিয়েছিলেন।

এই বন্ধুরা, যাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিলো খুব হালে, অবশ্যই এই প্রচলিত কথাটা না বলে পারলেন না:

'পৃথিবীটা নেহাৎই ছোট্ট!'

তারপর এলজা বললেন:

'তাড়াতাড়ি এসে মৌমাছিগুলো দেখুন।'

মৌমাছি-বিশারদরা তুন্দ্রায় পৌঁছে দেখতে পেলেন ফুলে-ঢাকা সমস্ত জায়গাটা ছেয়ে গেছে মৌমাছিতে, প্রত্যেকটি মৌমাছি বসেছে নিজের-নিজের ফুলে।

সন্ধেয় 'সুমেরু' রাষ্ট্রীর খামারে, 'ইণ্ডাস্ট্রিয়া' খামারে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে আর মঞ্চেগোরস্কে জানা গেল: প্রত্যেকটি ঝাঁক দুই থেকে চার কিলোগ্রাম মধু সংগ্রহ করেছে।

১১

মৌমাছিদের শেষ চালানটাকে বারেণ্টস্ সমুদ্র পেরুবার পর লরিতে করে সোজা নিয়ে যাওয়া হোলো পেচেঙ্গায়। জোয়ারের জলে স্টিমারটা খুব উঁচু হয়ে উঠেছিলো, ফলে চাকগুলোকে হাতে করে ভরতে আর ঝুলন্ত লাইফ-বোটগুলোর পাশ কাটাতে খুব অসুবিধে হয়েছিলো। বন্ধুর পথের উপর দিয়ে লরিতে মৌমাছিদের নিয়ে যাবার মধ্যেও বিপদ ছিলো। পরে কিন্তু তাদের সত্তর ডিগ্রি অক্ষাংশে দেখে এবং এ

কথা জেনে যে তারা গড়পড়তায় যা মধু সংগ্রহ করে নিম্ন সুমেরু অক্ষাংশে তার চেয়ে তারা বেশী সংগ্রহ করেছে— বেশী আনন্দ পাওয়া গিয়েছিলো। এখানে এই নিয়মটা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হোলো যে: যত উত্তরে যাওয়া যাবে আলো হবে তত উজ্জ্বল, ফুলের মধ্যে মধু এবং দৈনিক মধু-সংগ্রহের পরিমাণ হবে তত বেশী।

সুমেরুর মধু আবিষ্কারের গল্পটাকে আমি এখানে শেষ করতে পারতাম, কিন্তু এটা আমি শুরু করেছিলাম ওকার তীরে, মৌমাছি-পালকদের মধ্যে আমার শৈশবের বর্ণনা দিয়ে। এখন এ কথা অনুভব না করে পারি না যে শৈশবের সেই বছরগুলো যেন উত্তরে বিস্তৃত হয়েছে। উত্তরকে আমি আমার নিজের সত্তার এতোটা দিয়েছি যে এখন মনে করি এ জায়গাটা যেন আমার স্বদেশেরই বিস্তৃতি। আর যেন শুনতে পাই এক কণ্ঠস্বর আমাকে প্রশ্ন করছে:

'নিজের চোখে তুমি তুন্দ্রার ফুলের প্রাচুর্য দেখেছো। তুমি নিজেই বলো যে খিবিনি তুন্দ্রায় বৃষ্টি না পড়ার সময় যখন তুমি ঘুরে বেড়াতে তোমার জামাকাপড় মধুতে চটচট করতো। কেন তা হলে উত্তরে মৌমাছি চালান দেবার কথা তুমি তখন সমাজের কাছে প্রস্তাব করোনি? তুন্দ্রার প্রতিটি ফুলই অপেক্ষা করে রয়েছে তার মৌমাছির জন্যে, তুমি

কী দারুণ একটা ভালো কাজ করতে পারতে—উত্তরের যাযাবর বলগা-হরিণ পালকদের তুমি দিতে পারতে লক্ষ-লক্ষ টন পুষ্টিকর আর উপকারী জিনিস।'

সুমেরুর মধু আবিষ্কার, ১৯৫০-এ সুমেরু অঞ্চলে মধুমক্ষিকালয় সংগঠনের গল্পটা আমি শেষ করবো উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে।

যখন আমি উত্তরে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতাম আর রূপকথা লিখতাম তারপর থেকে অর্দ্ধ শতাব্দীর পাঁচ বছর কম সময় কেটে গেছে। পায়ে হেঁটে, দৈবাৎ দেখা-পাওয়া ঘোড়ায় টানা গাড়িতে, সমুদ্রের তীর ধরে নৌকোয় আমি কোলা উপদ্বীপ পর্যন্ত গিয়ে মেরু মরুভূমিতে নিজেকে আবিষ্কার করেছিলাম একেবারে একলা।

পাহাড়ের ভিতরে অনাবিষ্কৃত হয়ে ঘুমিয়েছিলো আপাটাইট, ল্যাপল্যাণ্ডের পাহাড়গুলো স্বপ্নের মত মেঘের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলো মাথা খাড়া করে আর সুমেরু রাত্রির নিঃশব্দতার মধ্যে মানুষের প্রয়োজনের কথা ভুলে নিজের জন্যই শুধু বয়ে চলেছিলো নিভা নদী।

সে সময় উত্তরের ফুলের মতোই মৌমাছির আগমনের জন্য আমার হৃদয় অচেতন প্রতিভার মধু নিয়ে অপেক্ষা করে ছিলো। এ কারণেই সম্ভবত আমার অন্তর্নিহিত সত্তা

দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো অলঙ্ঘ্য সীমারেখা দিয়ে : এক দিকে ছিলো জীবনের প্রচ্ছন্ন তৃপ্তি ও অনেক আনন্দে-ভরা আমার প্রতিভা, অন্য দিকে এক অন্ধকার বিষণ্ণ মরুভূমি। সেই ভাবেই বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো আমার বাহ্যিক জীবন —যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না তার উজ্জ্বল পৃথিবীতে আর সুমেরু-রাত্রির বিষণ্ণ পৃথিবীতে। মনে হোলো সেই সীমারেখাকে কোনো মৌমাছিই অতিক্রম করতে পারেনি।

মনে হোলো তাই যেন আমি, যার স্বভাব রূপকথা রচনা করা, রোদের মধ্যে অতিক্রম করবো সেই মরুভূমি। সঙ্গে করে নিয়ে যাবো তার রূপকথাগুলিকে সুখী মানুষদের জন্য, এদিকে উত্তরের হতভাগ্য লোকদের সহ্য করতে হবে সূর্যহীন রাত্রি। আমি তাদের সাহায্য করবো না।

প্রত্যেকটি ধূমায়িত পাহাড় আমাকে যেন ফিসফিস করে বলেছিলো :

'চলে যাও।' আর আমার হৃদয় এই শত্রুভাবাপন্ন কথায় হয়েছিলো আহত—আমি শুধুই যেন এক পথিক।

উত্তরে-লেখা আমার রূপকথা বলেছিলো ফলের বাগান, নাইটিঙ্গেল, চেরি, রাস্পবেরির কাহিনীগুলিকে, এদিকে বাস্তবে উত্তরে তখন এমন কি একটা আলুও জন্মাতো না।

কিন্তু মখমলের মতো মাঠ, বড় বড় ফলের বাগান,

নাইটিঙ্গেল, ফুল কিংবা তুর্গেনেভ আর প্রিয় বৃদ্ধ মৌমাছি-পালকরা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের অবস্থা কি বাস্তবিকই ল্যাপল্যাণ্ডের চেয়ে ভালো ছিলো? আমাদের স্বদেশের চাষীদের কি মুজিক বলে অভিহিত করা হোতো না, যে কথাটার অর্থই হোলো যে যে-মাটি থেকে তার জন্ম সেই মাটির সঙ্গেই সে আবদ্ধ—নিগ্রোরা যেমন বন্দী থাকে তাদের কালো চামড়ার মধ্যে, আর শ্বেত ক্রীতদাস-প্রভুরা করে তাদের ঘৃণা? তাকে দেওয়া হোতো এক টুকরো বাজে জমি, সন্তান জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে যেটা হয়ে যেতো ছোটো, জমিটাকে ভাগ করে দিতে হোতো তাদের মধ্যে।

বিনাশের অনুভূতিতে একেবারে শৈশব থেকে আমরা বড় হয়ে উঠতাম। আমাদের সচেতন চিন্তার প্রথম রশ্মির মধ্যে নিহিত ছিলো মানুষের উপর অভিশাপের কাহিনী, স্বর্গ থেকে তার বহিষ্করণ, এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুটি রোজগার করার তার শাশ্বত শাস্তি। আর যখন আমরা যুবক হয়ে উঠতাম আর মানুষের অভিশাপের কাহিনীর সঙ্গে বুদ্ধি যখন সংগ্রাম করতে শুরু করতো তখন আমরা সম্মুখীন হতাম ম্যালথুসের বীভৎস 'নিয়মের'। সে নিয়ম মানুষকে প্রকৃতির কাছে চিরকালের জন্য ক্রীতদাস থাকার দণ্ডবিধান করেছিলো: ধারণা করা হয়েছিলো মানুষের সংখ্যা বাড়ে

গুণোত্তর শ্রেণীতে, এদিকে খাদ্য বাড়ে সমান্তর শ্রেণীতে। আরো পরে যখন আমরা বড় হয়ে সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করতাম তখন আমাদের শপথ করে স্বীকার করতে হোতো জারের আনুগত্য। সে ছিলো প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতিমূর্তি।

সম্ভবত এটাই সে ঘটনার কৈফিয়ৎ যে আমি, যে সময়ে আমি বেঁচেছিলাম সে সময়কার খানিকটা ক্রীতদাস আমি নিজেই ছিলাম বলে, তুন্দ্রার উপর ঘুরে বেড়াতাম মধু-চটচটে জামাকাপড় পরে, আর কখনো ভাবতাম না উত্তরে মৌমাছি চালান দেবার প্রচেষ্টা করার কথা।

এই বিনাশের অনুভূতিটা ছড়িয়ে পড়েছিলো সবকিছুর উপর, অবশ্যই তার অন্তর্গত ছিলো এই ধারণাটা যে আবহাওয়ার অবস্থার জন্য মৌমাছিরা উত্তরে বাঁচতে পারবে না। উক্ত সময়কার বিষণ্ন অনুভূতির কবলিত প্রত্যেক মানুষই নিজের প্রতিভাকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতো। সেই সীমাকে ছাড়ালে যেন সর্বনাশ হবে। আমাদের নিজেদের সময়কার মতাদর্শ দ্বারা সবচেয়ে সৎ লোকেরা হতেন শাসিত: সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর অনিবার্যভাবে প্রতিভা বিকশিত হবে এক ধরনের ব্যক্তিগত সৌভাগ্যের মতো।

মৃত্যুর মতো অনিবার্যতাকে প্রণাম করার ভঙ্গীতে যে সব জায়গার ভিতর দিয়ে আমি ঘুরে বেড়িয়েছিলাম সে সব জায়গায় এখন জেগে

উঠেছে সহর, সুমেরু রাত্রি হয়ে উঠেছে দিনের মতো আলোকিত, আমাদের অক্ষাংশে যে সব সব্‌জি জন্মায় ঠিক সেই সব্‌জিই জন্মায় এখন সেখানে। আর এখন আমার টেবিলের স্ফটিক পাত্রের ভিতরকার সুগন্ধী, উপকারী জিনিসটির উপর প্রতিফলিত হচ্ছে বৈদ্যুতিক বাতির আলো —সুমেরুর মধুর উপর। আগে কখনো তাকে দেখা যায়নি। তার অস্তিত্বের প্রধান কারণ নতুন, মুক্ত মানুষের প্রচেষ্টা।

১৯৫১

অরণ্যের প্রভু

মাকড়সার জাল

ছোটো ছোটো ছেলেরা যখন অরণ্যে যায় তখন তারা সাধারণত প্রকৃতির উপর নিজেদের ক্ষমতা দেখাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে—ডালপালা ভেঙে, গাছের গুঁড়ির রজনে আগুন জ্বালায়, জীবন্ত গুঁড়িতে পেরেক ঠোকে, পাখীর বাসা নষ্ট করে। 'পাইওনিয়ারদের' শিবিরের কথা বিবেচনা করার সময় শিবিরের চারিপাশের অরণ্যের অবস্থাটা আমাদের লক্ষ্য করতে হয়ই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি মনে করি না আমরা গাছগুলোর যে সব অনিষ্ট আবিষ্কার করে থাকি তার জন্য সব সময় ছেলেমেয়েরা দায়ী। এক সময় সবাই আমরা শিশু ছিলাম, আমাদের

মনে পড়ে কী রকম আমরা চাইতাম প্রভুত্ব করতে, প্রকৃতির সবকিছুর উপর ক্ষমতা বিস্তার করতে। ছোটদের মধ্যে, বিশেষ করে ছেলেদের মধ্যে প্রভুত্ব করার যে অতি প্রচলিত ইচ্ছেটাকে দেখা যায় সেটা আমার মনে হয় একটা জন্মগত গুণ, আর খুব ভালো গুণ সেটা। সেটার শুধু একমাত্র দোষ এই যে প্রত্যেক শিশু নিজের স্বার্থের জন্য প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়, আর মাঝে মাঝে সমাজের পক্ষে হয়ে ওঠে বাস্তবিক বিপজ্জনক। তাই শুধুই শিশুদের উপর আমাদের রাগ করা উচিত নয়—তার বেশ খানিকটা ভাগ তাদের শিক্ষকদেরও প্রাপ্য। শিশুদের স্বাভাবিক প্রভুত্ব করার অনুভূতিকে চালনা করা দরকার এমন খাতে যাতে সমাজের উপকারে সেটা লাগে এবং শিশুদের এ বিষয়ে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন যে তারা যেন নিজেদের সামাজিক মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে দেখে, যে সামাজিক মানুষদের প্রকৃতির দানকে কাজে লাগাবার হিতকর ক্ষমতা আছে।

প্রাচীন কালে 'সৃষ্টের প্রভু' হিস্যাবে মানুষের যে নৃশংসতাকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হোতো শিক্ষকরা চেষ্টা করতেন তার বিরুদ্ধে 'দয়ার' প্রবর্তন করতে ('শয়তান সাঙ্ঘাতিক, কিন্তু ঈশ্বর দয়ালু!')। এই ভাব-প্রবণ শিক্ষাটা

কোনো কাজের ছিলো না। গাছদের যে রকম রোপণ করার দরকার সে রকমই দরকার কাটার। প্রত্যেকটি পূর্ণ পরিণত অরণ্য বার্ধক্যে পৌঁছবার সময় কীট কিংবা আগুন দ্বারা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া কিংবা কীট দ্বারা বিধ্বস্ত হওয়ার চেয়ে সেগুলিকে আমাদের কাজে লাগানো ভালো ... তাই মাঝে মাঝে আমাদের নিষ্ঠুর হয়ে গাছ কাটতে হবে। তা ছাড়া শস্য ক্ষেতের প্রয়োজন হলে নির্ভুল পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের হবে গাছ উপড়ে ফেলতে আর জমি চষতে। নিষ্ঠুরতা ক্ষমতার মতো এবং করুণা যা কিছু জীবন্ত তার প্রতি মনোযোগের মতো। তারা প্রভুত্বের অনুভূতির অপরিহার্য অঙ্গ। সেগুলিকে কী করে ব্যবহার করতে হয় সেটা শিক্ষকদের নিশ্চয়ই দেখিয়ে দিতে হবে। কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকে নিঃসন্দেহে এই সব চিন্তাধারাকে অনেক বার প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষকের সহায়তা ছাড়াও সাধারণ মানুষ নিজেদের জীবনে তার সাক্ষাৎ পায়।

আমার জীবনে এই সব চিন্তাকে কী ভাবে আবিষ্কার করেছিলাম সেটা দেখাবার জন্য নিজের কথা বলতে ইচ্ছে করি। কিন্তু তার জন্য বহু সময় লাগবে। তার চেয়ে আমি বরং বলি এই সব চিন্তার সঙ্গে আমার দৈনন্দিন

সাক্ষাতের কথাটা, কী ভাবে সর্বদাই আমি ছাত্রের মতো অরণ্যে প্রবেশ করি আর বেরিয়ে আসি শিক্ষক হয়ে। অরণ্যে আমার দৈনন্দিন আবিষ্কারের কথাটা বলবো। সেগুলো হয়তো এমনিতে তুচ্ছ, কিন্তু সর্বদাই সেগুলো তাজা। যে কোনো জীবনীর চেয়ে সেগুলো আমার নিজের জীবনের পথকে বেশী তৎপর আর সঠিকভাবে ব্যক্ত করে।

আমার এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের কথা মনে পড়ছে, এমন উজ্জ্বল ছিলো দিনটা যে অরণ্যের অন্ধকারতম স্থানেও সূর্য-রশ্মি ভেদ করে গিয়েছিলো। আমি অরণ্য পথ দিয়ে চলছিলাম, এতো সরু পথ যে এক পাশের গাছগুলো পৌঁছেছিলো অন্য পাশে আর মনে হচ্ছিলো পাতাগুলো যেন পরস্পরের সঙ্গে কথা কইছে ফিসফিস করে। খুব মৃদুভাবে বইলেও বাতাস ছিলো, মাথার উপরকার এ্যাসপেনগুলো করছিলো মর্মর, এদিকে নীচে যথারীতি গম্ভীরভাবে দুলছিলো ফার্নগুলো। অকস্মাৎ একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম: পথের বাঁ থেকে ডান পাশে ছোটো ছোটো আগুনের তীর ছুটে যাচ্ছে এদিক ওদিক। এ রকম কোনো ঘটনার সম্মুখীন হলে সর্বদাই আমি যেমন মন দিয়ে তাদের লক্ষ্য করি এবারও সে রকম করলাম আর অল্পক্ষণের মধ্যে লক্ষ্য করলাম যে তাদের গতি আর বাতাসের গতি এক—বাঁ

থেকে ডাইনে। তারপর আমি লক্ষ্য করলাম যে ফার গাছের নব পল্লবগুলো তাদের পাটল বর্ণের আবরণ ত্যাগ করছে আর বাতাস প্রত্যেক গাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে এই অপ্রয়োজনীয় আবরণগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে উড়িয়ে। ফার গাছের প্রত্যেকটি নব পল্লব জন্মেছে একটি করে পাটল বর্ণের আবরণ নিয়ে, এখন নব পল্লবের যত সংখ্যা তত সংখ্যার আবরণ উড়ছে চতুর্দিকে — হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ...

আমি লক্ষ্য করলাম যে একটি উড়ন্ত আবরণ যখন একটি উড়ন্ত তীরকে করছে স্পর্শ, সেটি বাতাসে থাকছে ভেসে আর তীরটি যাচ্ছে অদৃশ্য হয়ে। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আবরণটা ঝুলছে অদৃশ্য মাকড়সার জাল থেকে, তার ফলে তীরগুলো যে কী তা আবিষ্কার করতে আর মাকড়সার জালের কাছে যেতে আমি সক্ষম হলাম — বাতাস মাকড়সার জালকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সূর্য-রশ্মির দিকে, ফলে জালটি উঠছে জ্বলে, তাই মনে হচ্ছে তীরটি যেন উড়ছে বাতাসের ভিতর দিয়ে। সেই সঙ্গে আমি এ কথাটা বুঝতে পারলাম যে পথের উপর দিয়ে বহু সংখ্যক এই রকম জাল রয়েছে ছড়িয়ে আর শুধুমাত্র হেঁটে গিয়ে না-জেনেই আমি হাজার হাজার সে রকম জাল নষ্ট করছি। আমি অনুভব করলাম যে আমার উদ্দেশ্যটা অরণ্যের প্রকৃত প্রভু হওয়া।

এই উদ্দেশ্য এতো প্রয়োজনীয় যে সব জালগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে অরণ্যের সমস্ত মাকড়সাদের খাটাবার অধিকার আমার আছে। কিন্তু এই মাত্র যে জালটাকে আমি আবিষ্কার করলাম সেটাকে ছিঁড়লাম না — সম্ভবত ঝুলে-থাকা আবরণটি আমাকে তীরের ব্যাপারটা আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছিলো! হাজার হাজার মাকড়সার জাল নষ্ট করে আমি কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি? একেবারেই না! আমি এমন কি তাদের দেখিওনি, আমার নিষ্ঠুরতা আমার শারীরিক শক্তির ফল। সেই একটি জালকে বাঁচাবার জন্য আমার ক্লান্ত পিঠকে নীচু করার সময় আমি কি দয়ালু হয়েছিলাম? একেবারেই না — অরণ্যে আমি ছাত্রের মতো ব্যবহার করি, যদি সম্ভব হয় তা হলে স্বেচ্ছায় কোনো কিছু স্পর্শ করি না। আমি মনে করি যে এই জালটার বাঁচবার কারণ আমার একাগ্র মনোযোগ।

অরণ্যের প্রভু

দিনটা ছিলো রৌদ্রোজ্জ্বল। এখন আমি বর্ষার ঠিক আগেকার অরণ্যের কথা বলবো। প্রথম বিন্দুগুলির প্রত্যাশায় এমন এক স্তব্ধতা আর উত্তেজনায় কঠিন ভাবটা

সেখানে বিরাজ করছিলো যে মনে হচ্ছিলো প্রথম বৃষ্টিবিন্দুকে ধরার জন্য প্রত্যেকটি ছোটো পাতা, প্রত্যেকটি পাইনের কাঁটাগুলো চেষ্টা করছে। এখন অরণ্যের প্রত্যেকটি ছোটো ছোটো জীবকে মনে হচ্ছে যেন তার নিজস্ব বিশেষ ধরনের অভিব্যক্তিকে ফুটিয়ে তুলেছে।

সেই মুহূর্তে তাদের সবাইকার কাছে আমি গেলাম। মনে হোলো: মানুষের মতো ওরা সবাই আমার দিকে মুখ ফিরিয়েছে, ওরা বোকা বলে আমাকে অনুরোধ করছে বৃষ্টিকে পাঠিয়ে দিতে—যেন আমি ঈশ্বর।

বৃষ্টিকে আদেশ দিয়ে আমি বললাম, 'এখন চলে এসো, বুড়ো! আমরা অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমাকে আসতেই হবে, অতএব শুরু করে দাও।'

কিন্তু বৃষ্টি আমাকে এবার গ্রাহ্যই করলো না। আমি আমার নতুন স্ট্র হ্যাটটার কথা ভাবলাম। বৃষ্টি পড়লে আমার টুপিটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর তারপর, তখনো আমার টুপিটার কথা ভাবতে ভাবতে একটা অদ্ভুত ফার গাছকে দেখলাম। ছায়ায় পূর্ণ বয়স্ক হয়ে ওঠায় তার সবগুলো ডাল নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। এখন, নির্দিষ্ট গাছগুলো কাটার পর, নিজেকে সে আবিষ্কার করেছে আলোর মধ্যে। তার ডালগুলো শুরু করেছে উপর দিকে উঠতে। যথা সময়ে

সবচেয়ে নীচু ডালগুলোও সম্ভবত নিজেদের উপর দিকে তুলে ফেলতো যদি না মাটির সংস্পর্শে এসে শিকড় গজিয়ে তারা হয়ে যেতো নিশ্চল... আর এই ঊর্ধ্বমুখী ডালওলা ফার গাছটার তলায় আপনা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে একটা চমৎকার তাঁবু! তার দেয়ালগুলোকে দৃঢ় করার জন্য আমি কতকগুলো ডাল কেটে দিলাম, ফুটিয়ে দিলাম একটা প্রবেশ-পথ আর বসবার জন্য অন্যান্য ডালগুলোকে দিলাম বিছিয়ে। বৃষ্টির সঙ্গে আমার আলাপটা শুরু করার জন্য আমি বসতে-না-বসতেই লক্ষ্য করলাম আমার ঠিক উলটো দিকে একটা বড় গাছে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আমি তাড়াতাড়ি তাঁবু থেকে কয়েকটা ডাল নিয়ে সেটাকে ঝাঁটা করে অগ্নি-শিখাগুলোর উপর আছড়ে ক্রমশ আগুন নিভিয়ে ফেললাম যাতে সেগুলো সেই গুঁড়ির চারিদিকের বল্কলকে পুড়িয়ে গাছের রসের প্রবাহকে থামাবার সময় না পায়।

সেই গাছের নীচেকার মাটিটা কোনো আগুনে ঝলসায়নি, এখানে গোরু কখনো চরেনি, সে রকম রাখাল ছেলেদের এখানে আসার সম্ভাবনা নেই যাদের সর্বদাই অগ্নিকাণ্ডের জন্য দোষ দেওয়া হয়ে থাকে। আমার শৈশবের বোম্বেটে দিনগুলোর কথা মনে পড়ায় আমি বুঝতে পারলাম কোনো ফচকে ছোঁড়া হয়তো গাছের গুঁড়ির রজনে দুষ্টুমি করে

আগুন দিয়েছিলো কী ভাবে সেটা পোড়ে দেখার জন্য। শৈশবের বছরগুলোয় ফিরে গিয়ে আমার মনে পড়লো দেশলাই জ্বালিয়ে গাছে আগুন দেওয়াটা কী রকম মজার ব্যাপারই না ছিলো।

আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে রজনটা যখন জলতে শুরু করেছিলো তখন অপরাধী নিশ্চয়ই অকস্মাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে কাছাকাছি ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে। তাই, যেন এমনি সামনে এগিয়ে যাচ্ছি এমন ভাব দেখিয়ে, আগুনের কাছ থেকে শিস দিতে দিতে হেঁটে প্রায় দশ-বিশ পা চলে গিয়ে অকস্মাৎ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে ফিরে গেলাম ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে।

শয়তানটা আমাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলো না। একটি সোনালী চুলওলা সাত-আট বছরের ছেলে ঝোপ থেকে বেরুলো। তার চোখগুলো দুর্দান্ত আর বড় বড়, রোদে পুড়ে লালচে হয়ে গেছে, শরীরটা অর্দ্ধ-নগ্ন আর গঠনটা চমৎকার। যেদিকে আমি গিয়েছিলাম সেদিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা ফারের ফল কুড়িয়ে স্পষ্টতই সেটা দিয়ে আমাকে আঘাত করার জন্য এমন জোরে টিপ করে সে ছুঁড়লো যে নিজের পায়ের উপর গেলো ঘুরে। এতে মনে হোলো না সে বিরক্ত হয়েছে—বরঞ্চ তার উলটোটাই।

অরণ্যের আসল প্রভুর মতো সে তার পকেটের মধ্যে হাত ভরে, আগুন যেখানে লেগেছিলো সেদিকে তাকিয়ে বললো :

'বেরিয়ে আয় জিনা, লোকটা চলে গেছে।'

তার চেয়ে সামান্য বড় আর লম্বা একটি মেয়ে হাতে একটা বড় ঝুড়ি নিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো।

ছেলেটি বললো, 'জিনা, তুই জানিস ব্যাপারটা কী?'

বড় বড় শান্ত চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে জিনা শুধু বললো :

'না, জানি না।'

অরণ্যের প্রভু চেঁচিয়ে উঠলো, 'তুই কিছু জানিস না! তোকে আমি বলছি ও লোকটা এসে যদি আগুনটা না নিভিয়ে দিতো ওই গাছটা থেকে সমস্ত বনে তা হলে আগুন লেগে যেতো। সেটা একটা দেখার মতো ব্যাপার হোতো না কি?'

জিনা বললো, 'তুই একটা বোকা।'

আমি বললাম, 'ঠিক বলেছো জিনা। ও ধরনের জিনিস নিয়ে বড়াই করে ও খুব বোকামির পরিচয় দিয়েছে।'

আমি এই কথাগুলো বলতে না বলতেই অরণ্যের উদ্ধত প্রভু দৌড় দিলো।

কিন্তু স্পষ্টতই দুর্বৃত্তের হয়ে জবাবদিহি করতে জিনার

বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিলো না। আমার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইলো, শুধু খানিক বিস্ময়ে উপরে তুললো তার ভ্রূ দুটো।

এ ধরনের ছোট্ট বুদ্ধিমতী মেয়েকে দেখে তার সহানুভূতি লাভ করার জন্য সমস্ত ব্যাপারটাকে আমার লঘু করে তোলার ইচ্ছে হোলো যাতে আমরা দু'জনে অরণ্যের প্রভুকে কায়দা করতে পারি। ইতিমধ্যে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষমান সমস্ত জীবিত প্রাণীর উত্তেজনায় কঠিন ভাবটা পৌঁছলো চরমে।

আমি বললাম, 'জিনা, দেখো কী ভাবে প্রত্যেকটি ছোটো ছোটো পাতা, প্রত্যেকটি ঘাস বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছে। এমন কি বুনো লেটুসটা সবপ্রথম ফোঁটার জন্যে তৈরী হয়ে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর উঠে পড়েছে।'

ঠাট্টাটা তারিফ করে ছোট্ট মেয়েটি আমার উদ্দেশ্য সদয় হাসি হাসলো।

বৃষ্টিকে আমি বললাম, 'এসে পড়ো, বুড়ো। আমাদের সবাইকে তুমি জেরবার করে ফেলেছো — চলে এসো এখন, এসো!'

এবার বৃষ্টি আমার কথা শুনলো। ছোট্ট মেয়েটি তার চিন্তিত দৃষ্টি আমার উপর ফেলে তার ঠোঁট দুটো কোঁচকালো, যেন বললো: 'ঠাট্টাটা ভালোই, কিন্তু বাস্তবিকই এখন বৃষ্টি পড়ছে'।

তাড়াতাড়ি আমি বললাম, 'জিনা, বলো তোমার ওই বড় ঝুড়িতে কী আছে'।

সে আমাকে দেখালো—সেখানে ছিলো দুটো বড় বড় ব্যাঙের ছাতা। আমরা আমার নতুন টুপিটা ঝুড়িতে ভরে সেটাকে ফার্ন দিয়ে ঢেকে বৃষ্টি থেকে আশ্রয় নেবার জন্য গেলাম আমার সেই তাঁবুতে। সেখানে প্রবেশ করার আগে আরো কিছু ডালপালা ভেঙে সেটাকে ভালো করে ঢেকে দিলাম।

ছোট্ট মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠলো, 'ভাসিয়া! বাঁদরামো রাখ—বেরিয়ে আয়!'

বৃষ্টির খোঁচা খেয়ে অরণ্যের প্রভু আর দেরী না করে দেখা দিলো।

আমাদের পাশে বসে ছেলেটি যে মুহূর্তে কথা বলতে উদ্যত হোলো আমি আমার তর্জনী তুলে অরণ্যের প্রভুকে আদেশ দিলাম চুপ করে থাকতে।

'একটা কথাও না!'

আমরা তিন জনে বসে রইলাম স্থির আর স্তব্ধ হয়ে।

গ্রীষ্মের উষ্ণ ঝমঝমে বৃষ্টির সময় অরণ্যের কোনো ফার গাছের নীচে বসে থাকার মুগ্ধ অবস্থার কথা প্রকাশ করা অসম্ভব। একটি হেজেল-গ্রাউজ পাখী আমাদের ঝাঁকড়া ফার গাছের একেবারে মাঝখানে বৃষ্টি থেকে আশ্রয় নিলো আর

নামলো আমাদের তাঁবুর উপর। একটি ফিঞ্চ পাখী আমাদের সামনে বসলো একটা ডালের নীচে। একটা শজারুকে দেখা গেলো। এপাশে ওপাশে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে পালালো একটা খরগোশ। আর বৃষ্টি চললো ক্রমাগত পড়ে, ফার গাছকে ফিসফিস করে বলে চললো তার গোপন কথা। আমরা সেখানে বসে রইলাম অনেকক্ষণ ধরে আর মনে হতে লাগলো সত্যিকারের অরণ্যের প্রভু তাঁর গোপন কথা আমাদের প্রত্যেককে ফিসফিস করে বলছেন।

মৃত গাছ

বৃষ্টি যখন থেমে গেলো আর সবকিছু উঠলো ঝলমল করে আমরা এক পায়ে-চলা পথ ধরে অরণ্য থেকে বেরুলাম। একেবারে অরণ্যের কিনারে একটা বিরাট একদা শক্তিশালী গাছ দাঁড়িয়েছিলো। সেটা সেখানে দাঁড়িয়েছিলো বহুকাল ধরে। এখন কিন্তু সেটা একেবারে মরে গেছে। কাঠুরেরা এ রকম গাছকে বলে মৃত-গাছ।

এই গাছটাকে পরীক্ষা করে আমি ছেলেমেয়েদের বললাম:

'হয়তো কোনো পথিক এখানে বিশ্রাম করেছিলো আর তার কুড়ুলের ফলকটাকে এই গাছের গুঁড়িতে বসিয়ে তার হাতলে ঝুলিয়ে দিয়েছিলো একটা ভারী বস্তা। তারপর

গাছটা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার ক্ষতকে সারাতে চেষ্টা করে রজন দিয়ে। কিংবা হয়তো একটা কাঠবেড়াল কোনো শিকারীর কাছ থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয় একেবারে গাছটার মগডালে, আর কাঠবেড়ালটাকে ভয় পাইয়ে তার আশ্রয় থেকে বার করার জন্য সেই শিকারী একটা ভারি কাঠ দিয়ে এর গুঁড়িতে আঘাত করতে শুরু করে। মাঝে মাঝে ও ধরনের একটি মাত্র আঘাতই গাছকে জখম করার পক্ষে যথেষ্ট।

এমন বহু জিনিস আছে যার জন্য মানুষ কিংবা যে কোনো প্রাণীর মতোই গাছেরাও অসুস্থ হয়ে পড়ে। হয়তো এর ওপর বাজ পড়েছিলো।

কারণটা যাই হোক না কেন, গাছটা তার ক্ষত সারাতে শুরু করে রজন দিয়ে। গাছ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে পোকার দল সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করে সে কথাটা। বল্কল-কীট গুঁড়ির মধ্যে কুরে কুরে ঢুকে কামড়ে কাজ শুরু করে দেয়। কোনো-না-কোনো উপায়ে কাঠ-ঠোকরা আবিষ্কার করে পোকাটা কোথায় রয়েছে, সেটাকে খোঁজার জন্য গুঁড়ির ওপর এখানে সেখানে সে শুরু করে ঠোকরাতে। তাতে কিছু সময় লাগে। কিংবা হয়তো কাঠ-ঠোকরাটা যখন গাছের ছালটা ঠোকরাচ্ছে আর পোকাটার ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, পোকাটা তখন গিয়েছে পালিয়ে। বনের ছুতোরকে ঠোকরাবার ঠোঁট দিয়ে পোকাটাকে খুঁজতে হবে অন্য জায়গায়। আর অবশ্যই অনেক আছে বল্কল-কীট আর কাঠ-ঠোকরা। তাই কাঠ-ঠোকরারা গাছের গুঁড়ি ক্রমাগত যায় ঠুকরে, গাছটা হয়ে পড়ে ক্রমশ দুর্বল, আর প্রত্যেকটা ক্ষত সারায় রজন দিয়ে।

এখন গাছটার গুঁড়ির চারদিকের আগুনের চিহ্নগুলো দেখো। তোমরা বুঝতে পারবে যে লোকে এই পথটা ব্যবহার করে, লোকে এখানে করে বিশ্রাম, আর যদিও বনে আগুন জ্বালানো বারণ, তবু তারা কাঠকুটো জোগাড় করে সেগুলোয় আগুন ধরায়। আগুনকে তাড়াতাড়ি জ্বলাবার জন্যে তারা গাছের গুঁড়ি থেকে রজন-ভেজা ছাল ছাড়িয়ে নেয়। এইভাবে যেখানে ছাল ছাড়ানো হয় সেখানে গাছের গুঁড়ির চারপাশে ক্রমশ একটা শাদা চক্র জেগে উঠেছে, গাছের রসের ঊর্ধ্বগতি গেছে থেমে আর গাছটি গেছে শুকিয়ে। এখন আমাকে বলো যে চমৎকার গাছটি অন্তত দু' শতাব্দী ধরে তার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েছিলো তার ধ্বংসের জন্যে কে দায়ী—অসুস্থতা, বজ্রপাত, বল্কল-কীট, না কাঠ-ঠোকরা?'

'বল্কল-কীট!' ভাসিয়া চটপট বলে উঠলো।

আর তারপর জিনার দিকে আড়চোখে চেয়ে নিজেকে শুধুরে নিলো :

'কাঠ-ঠোকরা।'

স্পষ্টতই এই ছেলেমেয়েরা খুব বন্ধু। আর চঞ্চল ভাসিয়া বুদ্ধিমতী, শান্ত জিনার মুখের ভাব থেকে সত্য কথা বুঝতে অভ্যস্ত। এবারেও নিশ্চয়ই তার মুখ দেখে সে সত্যকে বুঝতে পারতো, কিন্তু আমি তাকে প্রশ্ন করলাম :

'আর জিনা, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি কি মনে করো, খুকি?'

ছোট্ট মেয়েটি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো যেন আমি ইস্কুলের শিক্ষক, তারপর উত্তর দিলো :

'আমার মনে হয়—মানুষেরই দোষ।'

'মানুষ, মানুষ, নিশ্চয়ই!'

মনে যা ছিলো সব কথা তাদের বললাম আসল শিক্ষকের মতো। বললাম যে কাঠ-ঠোকরা আর বল্কল-কীটের দোষ নয়, কারণ মানুষের মতো তাদের মনও নেই, অন্তঃকরণও নেই যাতে তারা বুঝতে পারে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। বললাম আমাদের সবাইকার মধ্যে প্রকৃতির এক প্রভু রয়েছে, কিন্তু অরণ্যকে বোঝার আগে তাকে ব্যবহার করার অধিকার এবং অরণ্যের আসল প্রভু হবার

আগে আমাদের গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। নিজের কথা তাদের বলতে আমি ভুললাম না—কী ভাবে এখনো আমি সব সময় শিখছি আর কোনো পরিকল্পনা বা ধারণা ছাড়া অরণ্যের জীবনে কখনো আমি হস্তক্ষেপ করি না। হালে আমার অগ্নিময় তীর আবিষ্কারের কথাটাও তাদের বলতে আমি ভুললাম না, আর বলতে ভুললাম না কী করে এমন কি একটা মাকড়সার জালকেও বাঁচিয়েছি।

তারপর আমরা অরণ্যের বাইরে গেলাম। এখন সর্বদাই এ রকম ঘটে—অরণ্যে আমি ঢুকেছিলাম ছাত্র হিসেবে, বেরুলাম শিক্ষক হয়ে।

১৯৫০

ভাসিয়া ভেসেলকিন

যখন সমস্ত তুষার গলে নদীতে পড়লো (আমরা মস্কো নদীর তীরে থাকি) গ্রামের উষ্ণ কালো মাটির উপর সর্বত্র দেখা দিলো শাদা শাদা মুরগি।

'উঠে পড়, জুলকা!' আমি আদেশ দিলাম।

আমার প্রিয় কুকুর এলো কাছে—সে তরুণ শিকারী কুকুর, চামড়াটা শাদা, তার উপর প্রচুর কালো বুটকি।

লম্বা চামড়ার ফিতেটার, যেটা একটা কাঠিমে জড়ানো ছিলো, খোলা দিকটার ধাতুর আংটাটা তার কলারের সঙ্গে এঁটে দিলাম আর জুলকাকে শেখাতে শুরু করলাম শিকার করতে। মুরগিগুলো হোলো শিকার। এই শিক্ষার মানে কুকুরকে মুরগি ধরবার চেষ্টা না করে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

এইভাবে কুকুরকে আমরা শেখাই সামনে ছুটে না গিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখাতে শিকার কোথায় লুকিয়ে রয়েছে। শিকারীরা এটাকে বলে 'দেখিয়ে দেওয়া': কুকুরটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর শিকারী পাখীর উপর হয় গুলি করে কিংবা ছুঁড়ে দেয় একটা জাল।

যে দুর্জ্ঞেয় শক্তি মুরগির দিকে কুকুরকে টানে তার কথা শিকারীরা ভালো করে বোঝে আর শিকারীদের ভাষায় নিজেরা তার একটি বিশেষ নামও দিয়ে থাকে। এ কথা কিছুতেই কল্পনা করা উচিত হবে না যে মুরগি কিংবা অন্য পাখীর মতো মুখরোচক খাদ্যের লোভে কুকুর আকৃষ্ট হয়। না, সে অনুপ্রাণিত হয় যা কিছু জীবন্ত, যা কিছু নড়তে, দৌড়তে, সাঁতরাতে বা উড়তে পারে তাকে থামিয়ে দেবার তীব্র ইচ্ছার দ্বারা।

যাই হোক, উষ্ণ, কালো মাটির উপর দেখা দিলো শাদা মুরগিগুলো আর জুলকা আকৃষ্ট হোলো তাদের দিকে। তাদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে, তাদের কোনো একটির দু' কিংবা তিন মিটার দূরে সে গেলো থেমে। যখন সে ও রকম অবস্থায় পৌঁছলো আমি তখন চামড়ার ফিতেটা খোলা বন্ধ করে সেটা জোরে মুঠো করে ধরলাম। অল্পক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর জুলকা চেষ্টা করলো মুরগিটার

দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে। মুরগিটা চীৎকার করে উড়ে পালালো, আর চামড়ার ফিতেটা ধরে আমি এমন জোরে টান মারলাম যে জুলকা পড়লো চিৎ হয়ে।

তাকে শিক্ষা দেবার জন্য আমাকে ও রকম জোরে মাত্র একবারই টান মারতে হয়েছিলো।

'শুয়ে পড়!' দ্বিতীয়বার ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হবার পর আমি চীৎকার করে উঠলাম।

শীতকালে বাড়িতে সে শিখেছিলো 'শুয়ে পড়' আদেশটা মানতে। এখন সে উপুড় হয়ে পড়লো।

এ ঘটনা ঘটতে লাগলো দিনের পর দিন। এক সপ্তাহের সামান্য বেশী সময়ের মধ্যে মুরগিদের নিয়ে জুলকাকে আমি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা দিলাম। কুকুরটির চামড়ার ফিতেটা খুলে তাকে নিয়ে আমি গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারতাম। যখনই সে কোনো মুরগিকে দেখতো তখনই দাঁড়িয়ে সে পাখীটার দিকে একটা চোখে আর অন্য চোখে আমার দিকে তাকাতো। যে মুহূর্তে আমি তার দৃষ্টির বাইরে চলে যেতাম মুরগিটাকে ছেড়ে সে ছুটতো আমার পিছন পিছন।

আমাদের গ্রামের একমাত্র গৃহ-পালিত পাখী মোরগ আর মুরগি। মস্কো নদীর তীরে আমরা থাকি, রুব্‌লেভো জলাধার পেরিয়ে। এই জলাধার রাজধানীকে

পানীয় জল সরবরাহ করে। জল যাতে দূষিত না হয় তার জন্য গ্রামে জলের পাখীদের রাখা বারণ। মোরগ আর মুরগি সম্বন্ধে জুলকাকে আমি চমৎকার শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম যে নদীর অন্য পারে এক চাষী থাকেন, তিনি হাঁস পোষেন।

আমি বলতে পারি না সেগুলোকে পোষার তাঁর কী অধিকার ছিলো আর কেনই বা মস্কোর পানীয় জলের স্বার্থে কেউই এগিয়ে আসেননি। খুব সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটা এই যে সবাই যৌথখামারে অত্যন্ত ব্যস্ত, আর হাঁস ছাড়াও তাদের ভাববার মতো ছিলো অন্যান্য বিষয়। হাঁসদের মালিকটি ছিলো ভালো লোক, প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর সদ্ভাব — তাই হাঁস পালনের ব্যাপারটাকে সাময়িকভাবে কেউ দেখেও দেখতো না। এই হাঁসদের কথাটা আমি নিজেই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলাম, তাই শান্তভাবে হাঁটছিলাম। জুলকাকে স্বাধীনভাবে আমি আমার সামনে ডান থেকে বাঁয়ে আর বাঁ থেকে ডাইনে দিলাম ছুটতে।

কোনো বিপদের কথা না ভেবে আমরা গ্রামের শেষ সীমায় পৌছলাম। সেখানে নদীর দিকে একটা পায়ে-চলা পথ চলে গেছে। আমাদের আর নদীর মাঝখানে ছিলো একটা ঢিবি, সেটার ঘাসে-ঢাকা ঢালু

জায়গাটার উপর দিয়ে একটা শাদা পথ চলে গেছে। সেই পথকে মাড়িয়ে যেতো খালি কিংবা জুতো-পরা ছোটো-বড় পা। এই পথ দিয়ে জুলকা দৌড়ে উপরে চলে গেলো। মুহূর্তের জন্য টিবিটার উপর নীল আকাশের পটভূমিতে তার ছায়া-মূর্তিটা আমি দেখলাম। কুকুররা যখন 'দেখিয়ে দেয়' তখন তাদের মধ্যে উত্তেজনা-কঠিন যে ভাবটা লক্ষিত হয় তার ভঙ্গীর মধ্যে ছিলো সেই ভাবটা। আমি সেই সুপরিচিত 'শুয়ে পড়' চীৎকারটা করতে পারার আগেই সে অকস্মাৎ দৌড়ে দ্রুত গতিতে অন্য পাশে নেমে গেলো। সে পাশটা ছিলো আমার দৃষ্টির অন্তরালে। পরের মুহূর্তে আমি একটা জোরে ঝপাং শব্দ, আর তারপর চীৎকার আর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনতে পেলাম। সেই শব্দটা মেয়েদের কাঠের বেলন দিয়ে পাথরের উপর কাপড় আছড়াবার শব্দের মতো।

আমি দৌড়ে টিবিটার উপর উঠলাম, প্রতিটি বক্ষ-স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলতে লাগলাম: 'ওই। ওই। ওই। ওই।'

অত সহজে আমি যে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম তার কারণ জীবনে আমি বহু কষ্ট পেয়েছি। তোমার কুকুর কারুর পালিত পশুকে কামড়ালে তোমার করার কিছুই

থাকে না—তোমাকে গালাগালি খেতে হবে, অপমানিত হতে হবে যতক্ষণ না কুঁকড়ে ওঠো রেখা-বহুল শুকনো ব্যাঙের ছাতার মতো।

আমি ঢিবিটার চূড়োয় উঠে এমন দৃশ্য দেখলাম যেটা যে কোনো কুকুর শিক্ষককে পাগল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট: জুলকা নদীতে সাঁতার দিচ্ছে আর পালা করে ধরতে চেষ্টা করছে প্রত্যেকটা হাঁসকে। গণ্ডগোলটা সাঙ্ঘাতিক: হাঁসগুলো প্যাঁক-প্যাঁক করছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে, বাতাস ভরে গেছে হাঁসদের উড়ন্ত পালকে।

আমার শীস আর চীৎকারে কোনোই ফল হোলো না। একটা হাঁসের কাছে পৌঁছে জুলকা তার পালকগুলোকে ওড়ালো, আর হাঁসটা জুলকার কামড় খেয়ে তার শক্তি সংগ্রহ করে ডানার সাহায্যে খানিক জলের মধ্যে খানিক বাইরে দিয়ে ছটফট করে পালালো দ্বিতীয় কামড়টা এড়াবার জন্যে। জুলকা তারপর অন্য আর একটা হাঁসের দিকে ঘুরে তার পালকগুলোকেও ওড়ালো ...

জলের উপর দিয়ে তুষারের মতো ভেসে যেতে লাগলো হাঁসদের পালকগুলো।

সবচেয়ে অসুবিধের ব্যাপার নদী স্ফীত হয়ে ওঠায় সাধারণ পায়ে-চলার সেতুটিকে তখনো পুনঃস্থাপন

করা সম্ভব হয়নি। অকুস্থলের এক পা কাছেও আমি যেতে পারলাম না—সব ঘটনাই ঘটছে মস্কো নদীর একেবারে মাঝখানে। উভয় তীরের উপর উপছে পড়েছে নদীটি।

সবশুদ্ধ ছিলো আটটা হাঁস। শুধু সেগুলোকে আমি যে গোনবার সময় পেলাম তাই নয়, জেনারেলরা তাঁদের সৈন্যদের প্রতিটি দলের অবস্থানের কথাটা যেমন জানেন আমিও সে রকম তাদের প্রত্যেকটির অবস্থানের কথাটা জানলাম। আমার একমাত্র ভরসা ছিলো স্বয়ং হাঁসদের উপরে, যদি কোনো হাঁস রেগে উঠে জুলকাকে একটা কামড় দেয়—এই সম্ভাবনার উপর। কারণ জুলকা কাপুরুষ। যদি একটিমাত্র হাঁসও সেটা চেষ্টা করতো তা হলে অমন বীর পাখীর ঠোঁটের কাছ থেকে বাঁচবার জন্য জুলকা সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে ছুটে আসতো আশ্রয় নিতে...

আমার মনে হোলো একটা হাঁসের সে-কথাটা মাথায় এসেছে, তা হলে সবকিছুই ভালো হবে। কিন্তু ঠিক তখনই হাঁসদের মালিকের ছেলে ভিতিয়া ঝোপের ওপাশ থেকে ছুটে এলো একটা বন্দুক নিয়ে আর টিপ করলো জুলকার টলমলে মাথাটার উপর...

আমার বুকের স্পন্দন প্রায় থেমে গেলো। কিন্তু কেন আমি চীৎকার করলাম না, কেন আমি থামালাম না ছেলেটিকে?

সে-ঘটনাটার কথা এখন আমার মনে পড়ে যেন স্বপ্নের মতো, যেন আতঙ্কে আমি হয়ে গিয়েছিলাম বোবা। অবশ্যই আমি চেঁচাতাম যদি মুহূর্তের জন্যও সময় থাকতো। কিন্তু সবকিছু এতো দ্রুত ঘটে গেলো যে আমার চীৎকার করার সময়ও রইলো না।

জোরে বন্দুকের একটা আওয়াজ হোলো।

কিন্তু আমি দেখলাম যে ঝোপ থেকে একটা হাত বেরিয়ে ভিতিয়ার কাঁধের উপর ধাক্কা দিলো, আর গুলিটা ঝপাং করে জলের উপর পড়লো—যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে।

ভিতিয়া তখনই দ্বিতীয় নল থেকে গুলি চালাতে যাচ্ছিলো কিন্তু ঝোপ-থেকে-আসা এক কণ্ঠস্বর তাকে নিরস্ত করলো :

'তুই কী করছিস? হাঁসগুলোকে তাড়া করার কুকুরটার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এটা জলাধারের এলাকা—হাঁসগুলোই নিয়ম ভাঙছে, কুকুরটা নয়। বোকা কোথাকার, নিজের বাবাকেই তুই বিপদে ফেলবি।'

এ কথা শুনে আমি অবশ্য আমার বাক-শক্তি ফিরে পেলাম। গুলির শব্দে জুলকার চৈতন্য হয়েছিলো। আমার ডাক শুনে নদীর যে-তীরে আমি ছিলাম সে-তীরে সে এলো সাঁতরে।

তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারো জুলকার পরিত্রাণের জন্য তাকে আমি আমার আনন্দ দেখাবার মতো বাড়াবাড়ি

কিছু করিনি। বরঞ্চ তার উলটোটাই। আমি তার জন্য বিষণ্ণভাবে তীরে অপেক্ষা করে রইলাম, আর আমার মুখের অভিব্যক্তি দেখে সে বুঝলো যে আমি জানি কুকুরের সঙ্গে কী ভাবে কথা কইতে হয়।

আমি বললাম, 'চলে আয়, চলে আয়। এই সব হাঁসদের পালকের দরুণ তোকে জবাবদিহি করতে হবে!'

সে তীরে উঠলো। ভালো করে নিজের গা ঝাড়া দিয়ে, নাক দিয়ে শব্দ করে বালির উপর গড়িয়ে কুকুরের পদ্ধতিতে চেষ্টা করলো তার ভ্যাবাচাকার ভাবটাকে ঢাকতে। কিন্তু যতই সে চেষ্টা করুক না কেন, তার মুখ আর নাক থেকে সেই হাঁসদের পালকগুলোকে ছাড়াতে পারলো না।

'এই সব হাঁসদের পালকের জন্যে তোকে জবাবদিহি করতেই হবে!' আবার আমি বললাম।

অবশেষে, এই ভান করায় বিরক্ত হয়ে, সে আমার দিকে ফিরলো, আর তার মুখের অভিব্যক্তি থেকে বুঝতে পারলাম: 'কী করা যাবে, কর্তা? এটা যে আমার স্বভাব।'

আমি উত্তর দিলাম, 'না না, বাছা। তোর স্বভাবটাকে বদলাতে হবেই।'

'কী করতে হবে?' সে প্রশ্ন করে আমার দিকে এক পা এগুলো।

আমি বললাম, 'তোকে দেখাচ্ছি কী করতে হবে। এখানে আয়, শাস্তি পাবার জন্যে এখানে আয়।'

কিন্তু ঠিক ওটাই সে ভয় পাচ্ছিলো। মাটির উপর নীচু হয়ে শুয়ে, বালির উপর সামনের পা দুটো ছড়িয়ে, তাদের উপর মাথা রেখে, সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো বড় বড়, মানুষের মতো চোখে।

'কর্তা, আমাকে ক্ষমা করুন।' তার চোখগুলো বললো।

আমি বললাম, 'তোর নাকে হাঁসের পালক লেগে রয়েছে। ওই পালকটার জন্যে আমার কাছে তোকে জবাবদিহি করতে হবে।'

'আর আমি এ-কাজ করবো না', তার চোখগুলো বললো। সেই চোখের শাদা জায়গাটায় লাল লাল সুতো ফুটে উঠলো, তাতে বোঝা গেলো কী রকম মানসিক উদ্বেগ আর মনস্তাপে সে কষ্ট পাচ্ছে।

'আচ্ছা, বেশ।' আমি বললাম। আমার কথার সুরটা বুঝে সে ছুটে এলো আমার কাছে।

সবকিছুই ভালোয় ভালোয় শেষ হোলো। কিন্তু আনন্দের মধ্যে আমি জুলকার ত্রাণকর্তাকে লক্ষ্য করিনি। দৈনন্দিন কাজ করার জন্য যখন বাড়ি ফিরলাম অজ্ঞাত ত্রাণকর্তার কথা মনে পড়ায় কাজ করতে আমি পারলাম না। আমার

শিকার-প্রীতি, প্রকৃতি-প্রীতি ও কুকুর-প্রীতির জন্য আমার চমৎকার কুকুরের ত্রাণকর্তাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়লো ... তাই আমার কাজ ফেলে কয়েক কিলোমিটার দূরের ইস্কুলে গেলাম শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে। যে-হাতটা ভিতিয়াকে ধাক্কা দিয়েছিলো তার আকার, আর ঝোপের ভিতর থেকে যে-স্বর শোনা গিয়েছিলো তা থেকে আমি জানতাম যে ত্রাণকর্তাটি হবে নিশ্চয়ই কোনো ছেলে। আর যে সুযুক্তিপূর্ণ কথাগুলো সে চীৎকার করে বলেছিলো তা শুনে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে এ-ছেলেটি নিশ্চয়ই ইস্কুলে যায়।

শিক্ষককে আমি সব গল্পটা বলে যে-ছেলেটি জুলকাকে বাঁচিয়েছিলো আমার হয়ে সে ছেলেটিকে খুঁজে দিতে বললাম। আমি কথা দিলাম সে-ছেলেটিকে আমার প্রিয় বই 'মুণ্ডহীন ঘোড়সোয়ারের' একটি চমৎকার সংস্করণ উপহার দোবো। শিক্ষক বললেন ছেলেটিকে তিনি খুঁজে বার করবেন। জুলকাকে নিয়ে গেলাম জলাজমিতে আরো শিক্ষা দেবার জন্য। সেখানে রইলাম অনেক দিন।

শিকারের সময় এগিয়ে আসছিলো। জুলকার শিক্ষা শেষ করে আমি বাড়ি ফিরলাম এবং প্রথম দিনেই শিক্ষকের সঙ্গে

গিয়ে দেখা করলাম। জানা গেলো জুলকার ত্রাণকর্তাকে খুঁজে বার করা খুব সহজ নয়। কিন্তু সে যে ইস্কুলের ছেলেদের একজন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি বললাম, 'সে খুব ভালো কাজ করেছে। আমরা তাকে খুঁজছি, কারণ তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই। কেন সে আত্ম-প্রকাশ করতে চায় না?'

শিক্ষক বললেন, 'ঠিক ওই কারণেই। এমন কাজের জন্যে সে গর্ব করতে চায় না যার জন্যে তাকে কোনো দাম দিতে হয়নি। সে লজ্জা পেয়েছে, আর এ-ধরনের লজ্জাটা ভালো — সে শুধু এমন কাজ করেছে তার জায়গায় পড়লে যে-কোনো লোক সে-কাজ করতো।'

'কিন্তু সব ছেলেরাই সে-রকম নয়। তাকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবেই। অন্যদের কাছে উদাহরণস্বরূপ তাকে আমাদের তুলে ধরতে হবেই।'

'সেটা ঠিক কথা', শিক্ষক একমত হলেন।

খানিক ভেবে তিনি বললেন:

'আমার একটা মৎলব মাথায় এসেছে। আমরা তাকে বার করতে পারবো। আপনি বলতে পারেন কি কটা হাঁস ছিলো?'

'আটটা', আমি উত্তর দিলাম।

'মনে রাখবেন সে-কথাটা — "আটটা"!' শিক্ষক বললেন। 'এখন সব ব্যাপারটা নিয়ে একটা গল্প লিখুন। ঠিক যা-যা ঘটেছিলো সে কথা লিখবেন, আর পরিষ্কার করে উল্লেখ করবেন যে ঠিক আটটা হাঁস ছিলো।'

শিক্ষক তাঁর মৎলবের কথাটা আমার কাছে প্রকাশ করলেন না। আমিও জোর করলাম না। আমি আর শিক্ষক এক রবিবারে ব্যবস্থা করলাম গ্রামের ইস্কুলে নানা লেখকের মজার মজার গল্প পড়ার। আমার পালা এলো জুলকা আর হাঁসদের নিয়ে আমার লেখা বাস্তব জীবনের গল্পটা পড়ার। গল্পটাকে আরো বাস্তব করার জন্য ক্লাস-ঘরে আমার সঙ্গে ছিলো জুলকা। আমি দেখালাম কেমন করে সে 'শুয়ে পড়্!' কথাটা শোনে আর কেমন করে সে 'দেখিয়ে দেয়'। আনন্দটা চরমে উঠলো যখন আমি হাঁসের পালকের আর সত্যিকারের জেনারেলের মতো কী ভাবে প্রত্যেকটি হাঁসের অবস্থানের কথাটা মনে রেখেছিলাম সে-কথাটা পড়লাম।

'কতগুলো হাঁস ছিলো?' সেই মুহূর্তে প্রশ্ন করলেন শিক্ষক।

'আটটা ছিলো, ইভান সেমিওনিচ।'

'না', শিক্ষক বললেন। 'পনেরোটা ছিলো।'

'আটটা।' আমি জোর দিয়ে বললাম। 'আমি নিশ্চিতভাবে বলছি, আটটা ছিলো।'

'আর আমি আপনাকে বলছি', ইভান সেমিওনিচ জোরে বললেন, 'ছিলো ঠিক পনেরোটা। আমি সেটা প্রমাণ করতে পারি। আমরা সোজা মালিকের কাছে গিয়ে কি গুণে দেখবো? তাঁর পনেরোটা আছে।'

যখন এই তর্কটা চলছিলো তখন সত্য কথা বলার জন্য একটি কোমল, লাজুক হৃদয় ছটফট করছিলো। আর এই হৃদয়টি ছিলো যে-লোকটি কুকুর আর হাঁসদের নিয়ে গল্প লিখেছিলো তার পক্ষে। আমার শ্রোতাদের অন্যতম, আমার ভবিষ্যৎ-পাঠক, আমার পক্ষসমর্থক, তার বেঞ্চিতে বসেছিলো সত্যকে প্রকাশ করার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে।

'আপনাকে আমি বলছি, পনেরোটা হাঁস ছিলো', জোর দিয়ে শিক্ষক বললেন।

'না।' আমার বন্ধু চেঁচিয়ে উঠলো। 'আটটা ছিলো।'

এইভাবে আমার বন্ধু—মুখটা তার রাঙা হয়ে উঠেছে, চুলগুলো এলোমেলো, উত্তেজিত হয়ে তার চোখ দুটো ক্রুদ্ধভাবে শিক্ষকের উপর নিবদ্ধ—সত্যের পক্ষ অবলম্বন করলো।

সে ভাসিয়া ভেসেলকিন, লাজুক, নিজের সৎ কাজের জন্য লজ্জিত, সত্যের পক্ষসমর্থনের জন্য নির্ভিক।

'ধন্যবাদ, বন্ধু', আমি বললাম এবং জুলকার ত্রাণকর্তাকে দিয়ে দিলাম আমার শৈশবের প্রিয় বইটি— 'মুণ্ডহীন ঘোড়সোয়ার'।

১৯৪৯

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয় ২১ জুবোভস্কি বুলভার মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন
(Foreign Languages Publishing House Zubovsky boulevard, 21 Moscow, Soviet Union)

МИХАИЛ ПРИШВИН

КЛАДОВАЯ СОЛНЦА

Рассказы

মিখাইল প্রিশ্‌ভিন (১৮৭৩—১৯৫৪) মৌলিক ও প্রতিভাশালী লেখক। রুশী প্রকৃতির তিনি গুণগান করে থাকেন। বিখ্যাত সোভিয়েত লেখক মাক্সিম গোর্কি প্রিশ্‌ভিনের রচনার তারিফ করে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

'খুব মন দিয়ে আপনার বইগুলিকে আমি পড়েছি। সেগুলির মধ্যে আমি বহু গুণ আবিষ্কার করেছি। সে-গুণ আপনার নিজস্ব। আমার মতে আপনি শুধু প্রকৃতির কথাই লেখেন না, লেখেন প্রকৃতির চেয়েও বড় জিনিসের কথা। লেখেন পৃথিবীর কথা — আমাদের যিনি মা। আপনার বইগুলির মধ্যে পৃথিবীর প্রতি যে-রকম ভালোবাসা ও জ্ঞানের মিশ্রণ অনুভব করেছি সে-রকম অন্য কোনো রুশী লেখকের রচনায় আমি অনুভব করিনি। 'পৃথিবীর গুপ্তকথা' — আপনার এই কথাগুলি ভবিষ্যৎ মানুষের কথার মতো আমার কানে বারবার ধ্বনিত হচ্ছে। সেই ভবিষ্যৎ মানুষ হোলো পৃথিবীর সর্বশক্তিমান প্রভু — পৃথিবীর আনন্দ ও বিস্ময়ের স্রষ্টা। ঠিক এই গুণগুলিই আপনার রচনায় আমি আবিষ্কার করেছি। সেগুলি আমার মনে হয়েছে নতুন আর অসীম গুরুত্বপূর্ণ বলে। অধিকাংশ লোকেই পৃথিবীকে বলে থাকেন: 'আমরা তোমার' আপনি বলেন: 'তুমি আমার!'

